আয়নাঘর

ইয়াদ আল-কুনাইবী

নবী-রাসুল ﷺ-গণের জীবনীর দিকে লক্ষ করলে একটি বিষয় চোখে পড়ে। কোনো সম্প্রদায়ের কাছে দাওয়াহ দেয়ার সময়, তাঁরা ﷺ ওই সম্প্রদায়ের মূল সমস্যাকে চিহ্নিত করতেন, সরাসরি সতর্ক করতেন। মূল সমস্যাকে ফেলে রেখে বিভিন্ন গৌণ বিষয়ে মনোযোগী হতেন না তাঁরা ﷺ। এটাই নববী দাওয়াহর বৈশিষ্ট্য।

দুঃখজনকভাবে এ বৈশিষ্ট্য আজ বিরল। ইসলামের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের যুদ্ধের এ কালে আমাদের সামনে তুলে ধরা হয় কাটছাঁট করা এক ইসলামকে।

ড.ইয়াদ কুনাইবী ওইসব দা'ঈদের একজন, যাদের লেখা এবং বক্তব্যে ওপরে বলা নববী দাওয়াহর বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তিনি ওই কথাগুলো বলেন, যেগুলো আমরা শুনতে চাইনা, কিন্তু আমাদের শোনা দরকার।

এমন-সব কথনো অপ্রিয় কিন্তু সবসময় প্রয়োজনীয় চিন্তা, কথা আর উপলব্ধি দিয়ে সাজানো হয়েছে আয়নাঘর। আমরা আশা করি এ বই পাঠককে সাহায্য করবে নিজের, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে ইসলামের আয়নায় যাচাই করতে।

এ আয়নায় ফুটে ওঠা প্রতিবিম্ব অনেক সময় আমাদের পছন্দ নাও হতে পারে। কিন্তু কষ্ট হলেও এ প্রতিবিম্বকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা আমাদের নিজেদের এবং উম্মাহর সংশোধনের জন্য জরুরি।

আয়নাঘরে স্বাগতম...

নবী-রাসুল ﷺ-গণের জীবনীর দিকে লক্ষ করলে একটি বিষয় চোখে পড়ে। কোনো সম্প্রদায়ের কাছে দাওয়াহ দেয়ার সময়, তাঁরা ﷺ ওই সম্প্রদায়ের মূল সমস্যাকে চিহ্নিত করতেন, সরাসরি সতর্ক করতেন। মূল সমস্যাকে ফেলে রেখে বিভিন্ন গৌণ বিষয়ে মনোযোগী হতেন না তাঁরা ﷺ। এটাই নববী দাওয়াহর বৈশিষ্ট্য।

দুঃখজনকভাবে এ বৈশিষ্ট্য আজ বিরল। ইসলামের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের যুদ্ধের এ কালে আমাদের সামনে তুলে ধরা হয় কাটছাঁট করা এক ইসলামকে।

ড.ইয়াদ কুনাইবী ওইসব দা'ঈদের একজন, যাদের লেখা এবং বক্তব্যে ওপরে বলা নববী দাওয়াহর বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তিনি ওই কথাগুলো বলেন, যেগুলো আমরা শুনতে চাইনা, কিন্তু আমাদের শোনা দরকার।

এমন-সব কখনো অপ্রিয় কিন্তু সবসময় প্রয়োজনীয় চিন্তা, কথা আর উপলব্ধি দিয়ে সাজানো হয়েছে আয়নাঘর। আমরা আশা করি এ বই পাঠককে সাহায্য করবে নিজের, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে ইসলামের আয়নায় যাচাই করতে।

এ আয়নায় ফুটে ওঠা প্রতিবিম্ব অনেক সময় আমাদের পছন্দ নাও হতে পারে। কিন্তু কষ্ট হলেও এ প্রতিবিম্বকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা আমাদের নিজেদের এবং উম্মাহর সংশোধনের জন্য জরুরি।

আয়নাঘরে স্বাগতম...

আয়নাঘর

আয়নাঘর

ইয়াদ আল-কুনাইবী

অনুবাদ
ইলমহাউস অনুবাদক টিম

সম্পাদনা
আসিফ আদনান

...আজ আমরা বন্দী শত্রুর হাতে। কী মনে হয়?
আমরা কি পারব নীড়ে ফিরতে?

সূচীপত্র

সম্পাদকের কথা

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

সকল প্রশংসা আল্লাহ ﷻ-এর, যিনি আসমান ও যমিনের একচ্ছত্র অধিপতি, যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু, যিনি এক ও অদ্বিতীয়, অমুখাপেক্ষী, অপ্রতিরোধ্য, সার্বভৌম। তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমরা তাঁর কাছ থেকেই এসেছি এবং তাঁর কাছেই আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্য।

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবিদের ওপর।

নবী-রাসূল ﷵ-গণের জীবনীর দিকে লক্ষ করলে একটি বিষয় চোখে পড়ে। কোনো সম্প্রদায়ের কাছে দাওয়াহ পৌঁছে দেওয়ার সময়, তাঁরা ﷵ ওই সম্প্রদায়ের মূল সমস্যাকে চিহ্নিত করতেন এবং তাদের সরাসরি সতর্ক করতেন। মূল সমস্যাকে ফেলে রেখে বিভিন্ন গৌণ বিষয়ে তাঁরা ﷵ মনোযোগী হতেন না। তাঁরা ﷵ উপসর্গ দেখে, ব্যাধি শনাক্ত করতেন, তারপর সেটার চিকিৎসা করতেন। এটাই নববী দাওয়াহর বৈশিষ্ট্য।

দুঃখজনকভাবে এ বৈশিষ্ট্য আজ বিরল। 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'-এর নামে ইসলামের বিরুদ্ধে অ্যামেরিকার যুদ্ধের এ সময়ে সবকিছু যেন উলটে গেছে। অধিকাংশ দা'ঈ ও 'আলিমরা আজ ওই কথাগুলো বলেন, যেগুলো মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্র বা বিদ্যমান বিশ্বব্যবস্থা শুনতে পছন্দ করে। ওই কথাগুলো, যেগুলো আমাদের খাপ খাইয়ে নিতে শেখায় বিদ্যমানতার সাথে। কিন্তু যা শোনা জরুরি, যা করা আবশ্যক, তা বলা হয় না। চেষ্টা করা হয় না স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে সত্যকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরার। তার বদলে দেখা যায় সংঘাত এড়িয়ে চলার মানসিকতা। ইসলামকে নিয়ন্ত্রণ করার আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও রাষ্ট্রীয় এজেন্ডার সাথে যেকোনো মূল্যে খাপ খাইয়ে নেয়ার উৎকণ্ঠিত আকাঙ্ক্ষা।

অবধারিতভাবে অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া আজকালকার অধিকাংশ সেলেব্রিটি স্কলার কিংবা দা'ঈ, ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় আমাদের আত্মকেন্দ্রিক হবার শিক্ষা দেন। তাঁদের বেশিরভাগ আলোচনা সীমাবদ্ধ থেকে যায় আত্মশুদ্ধি, আমল, আখলাক, মা-বাবা, স্বামী-স্ত্রী কিংবা সন্তানের প্রতি দায়িত্ব, আর মন নরম করা আলোচনায়। নিঃসন্দেহে এ বিষয়গুলো ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু ইসলাম কেবল এ বিষয়গুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ না। ইসলাম শুধু 'আমি আর আমরা' এর সীমারেখায় আটকে থাকে না। ইসলাম আরও ব্যাপক।

আজকের দেশি-বিদেশি জনপ্রিয় বক্তাদের মাঝে ইসলামের এই ব্যাপকতা খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন। ইসলামের অবস্থান থেকে সৎ কাজের আদেশ আর মন্দ কাজে বাধা দেয়ার শিক্ষা সাধারণ মুসলিমদের সামনে তুলে ধরা হয় কালেভদ্রে। বলা হয় না ঘৃণ্য জাতীয়তাবাদের সাথে ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের সাংঘর্ষিকতার কথা। আল ওয়ালা ওয়াল বারা-র কথা। স্পষ্ট করা হয় না গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, লিবারেলিযমসহ নানান তন্ত্রমন্ত্রের সাথে তাওহিদের চিরন্তন লড়াইয়ের বাস্তবতা। ইসলামের সামাজিক ভূমিকা, আর শাসনব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা তো অনেকটাই ট্যাবু। গুরুত্ব পায় না সভ্যতার সংঘাতও। স্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায় না ইসলামের বিরুদ্ধে চলা যুদ্ধের ব্যাপারে। খুব একটা মনোযোগ পায় না সারা বিশ্বজুড়ে নির্যাতিত মুসলিমদের কথা, আর দিন দিন লম্বা হতে থাকা আক্রান্ত মুসলিম ভূখণ্ডের তালিকা। উচ্চবাচ্য হয় না ইসলামের বিভিন্ন দিককে 'সন্ত্রাস' আর 'উগ্রবাদ' নাম দিয়ে বেআইনি সাব্যস্ত করা নিয়েও। কথা হয় না আল্লাহর পৃথিবীতে আল্লাহ ﷻ-এর আইন বাস্তবায়ন নিয়ে।

আমাদের সামনে তুলে ধরা হয় কাটছাঁট করা এক ইসলামকে। অনেকে তো সরাসরি বলেই বসেন—'উম্মাহর কী অবস্থা তা নিয়ে ভাবার দরকার নেই, নিজেকে নিয়ে ভাবুন।' 'শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা হয়েছে কি না সেটা নিয়ে আপনাকে প্রশ্ন করা হবে না, নিজের আমল নিয়ে চিন্তা করুন।' 'আমি ও আমরা', 'এখানে ও এখন' নিয়ে ব্যস্ত থাকার শিক্ষা দেয়া হয় ইসলামের মোড়কে। চ্যালেঞ্জ করা হয় না বিদ্যমানতাকে। যা চলছে, যেভাবে চলছে এর মধ্যে থেকে শান্তি আর স্বস্তিতে, হাসিখুশি কতটুকু 'ইসলাম' পালন করা যায়, তা নিয়েই সব আলোচনা। সব আয়োজন। যেন নিরন্তর 'ভালোলাগার' কিংবা 'ভুলে থাকার' এক কল্পজগতে আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি। সারাক্ষণ যেখানে কুসুম কুসুম রোদ। রোদের আলস্য গায়ে মেখে সেখানে আমরা আত্মকেন্দ্রিকতার প্রাসাদ বানাই। ইটের পর ইট বসাই। আনন্দের অবসাদে ভুলে থাকি পতনের শব্দ আর ঝড়ের তাণ্ডব।

দাওয়াহর ব্যাপারে ড. ইয়াদ কুনাইবীর অ্যাপ্রোচ পছন্দ করার বিভিন্ন কারণ আছে। তাঁর বক্তব্য সহজ, সংক্ষিপ্ত, সোজাসাপ্টা। একইসাথে গভীর অর্থবোধক। কেবল তাত্ত্বিকতায় সীমাবদ্ধ না থেকে তিনি কথা বলেন আমাদের জীবন এবং আজকের পৃথিবীতে ইসলামের প্রয়োগ নিয়ে। তাঁর উপস্থাপনা যুগোপযোগী, আলোচনার বিষয়বস্তু বিস্তৃত। তাঁর কথাগুলো পাঠকশ্রোতাকে নাড়া দেয়। যেভাবে আমরা পৃথিবীকে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি সেই কাঠামোকে প্রশ্ন করতে বাধ্য করে। বাধ্য করে নিজেকে নতুন করে দেখতে, নিজের নিষ্ক্রিয়তা আর জড়তাকে প্রশ্ন করতে। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমার সবচেয়ে বেশি পছন্দের দিক হলো, ড. কুনাইবী ওইসব বিরল দা'ঈদের একজন, যাদের লেখা এবং বক্তব্যে ওপরে বলা নববী দাওয়াহর বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

ব্যক্তি ও পারিবারিক পর্যায়ে ইসলাম পালন করাকে অন্যরা যখন উম্মাহ ও ইসলামের জন্য কাজ করার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেন, তখন ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অনুযায়ী লেখক দুটোকে উপস্থাপন করেন পরিপূরক হিসেবে। 'নিজেকে নিয়ে চিন্তা করো, উম্মাহর কথা পড়ে ভাবা যাবে'—এই চরম আত্মকেন্দ্রিক মেসেজের বদলে তিনি বলেন—'নিজেকে আগুন থেকে বাঁচাতে হবে। উম্মাহর জন্য কাজ করতে হবে। তাই যত তাড়াতাড়ি পার নিজেকে গুছিয়ে নাও।'

তিনি ব্যক্তি-জীবন নিয়ে বলেন। পরিবার আর সমাজের কথা বলেন। বলেন আত্মশুদ্ধি, আমল আর ফযিলতের কথা। সেই সাথে বলেন ইসলামের বিরুদ্ধে চলা যুদ্ধের কথা। নির্যাতিত মুসলিমদের কথা। আমাদের দায়িত্বের কথা। তাওহিদ, মিল্লাতু ইব্রাহিম আর আর শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার কথা। ড. ইয়াদ কুনাইবী ওইসব দা'ঈদের একজন, যিনি ওই কথাগুলো বলেন, যেগুলো আমরা শুনতে চাই না, কিন্তু আমাদের শোনা দরকার।

ড. ইয়াদ কুনাইবীর এমনই-সব কখনো অপ্রিয় কিন্তু সব সময় প্রয়োজনীয় চিন্তা, কথা আর উপলব্ধি দিয়ে সাজানো হয়েছে আয়নাঘর। বইটিতে সংকলিত হয়েছে ২০১৩ থেকে ২০২০ এর মধ্যে প্রকাশিত তার বিভিন্ন প্রবন্ধ ও লেকচারের অনুবাদ। ইসলামী শরীয়াহ ও শাসনব্যবস্থা, আত্মশুদ্ধি, ইসলামের আলোকে পারিবারিক জীবন, সমাজ ও উম্মাহর প্রতি কর্তব্যসহ আরও বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়েছে লেখাগুলোতে। আমরা আশা করি এ বই পাঠককে সাহায্য করবে ইসলামের আয়নায় নিজেদের নতুন করে আবিষ্কার করতে। সাহায্য করবে নিজের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে ইসলামের আয়নায় যাচাই করতে। এ আয়নায় ফুটে ওঠা প্রতিবিম্ব অনেক সময় আমাদের পছন্দ নাও হতে পারে। কিন্তু নিঃসন্দেহে এ প্রতিবিম্বের দিকে মনোযোগ দেয়া, কষ্ট হলেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা আমাদের নিজেদের এবং উম্মাহর সংশোধনের জন্য জরুরি।

অনুবাদের ক্ষেত্রে শাব্দিক অনুবাদের বদলে মূল ভাব সংরক্ষণ এবং লেখকের বক্তব্য পাঠকের উপযোগী করে তোলার চেষ্টাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। অনেক জায়গায় বাংলাভাষী পাঠকের জন্য সহজবোধ্য করার জন্য মূল বক্তব্যের সাথে কিছু বিষয় যুক্ত করা হয়েছে। মানুষের কোন কাজই ক্রটিমুক্ত না। যদি সহৃদয় পাঠকের চোখে কোনো ভুল ধরা পড়ে তবে দয়া করা আমাদের জানাবেন।

যারা দীর্ঘ সময় নিয়ে বইয়ের পেছনে শ্রম দিয়েছেন আল্লাহ ﷻ তাঁদের প্রচেষ্টা কবুল করুন, উত্তম প্রতিদান দান করুন, এবং বারাকাহ দান করুন। সময়স্বল্পতা এবং ব্যস্ততার মাঝেও মুহতারাম ইফতেখার সিফাত ভাই হাদীসগুলোর তরজমা দেখে দিয়েছেন। আল্লাহ্ ﷻ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন। আল্লাহ ﷻ এ সংকলনকে ইসলাম এবং মুসলিমদের কল্যাণে কবুল করে নিন। আমাদের তাউফিক দান করুন ইসলামকে এর সম্মানিত ও উপযুক্ত স্থানে আবারও প্রতিষ্ঠিত করার।

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার ও সাহাবা ؓ-গণের ওপর, এবং সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহরই জন্য, এবং সাফল্যও শুধু তাঁরই পক্ষ থেকে।

আয়নাঘরে স্বাগতম...

আসিফ আদনান
রজব, ১৪৪১, মার্চ ২০২০

লেখক পরিচিতি

ড. ইয়াদ আল-কুনাইবী। জন্ম শাওয়্যাল, ১৩৯৫ হিজরি (অক্টোবর, ১৯৭৫)। পরিবারের আদি নিবাস ফিলিস্তিনের হেবরনে হলেও যায়নবাদী আগ্রাসনের কারণে হিজরত করে অবস্থান নিতে হয় কুয়েতে। ইয়াদ আল কুনাইবীর জন্ম কুয়েতেরই সালিমিয়াতে। পরে তার পুরো পরিবার জর্ডানের নাগরিকত্ব লাভ করে। এখন স্থায়ীভাবে আছেন আম্মানে।

ড. ইয়াদ কুনাইবী একজন দা'ই এবং অ্যাকটিভিস্ট। মানুষকে ইসলামের ব্যাপারে সচেতন করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন প্রায় দুই যুগ ধরে। নিজস্ব সামাজিক বলয়ে দাওয়াহর পাশাপাশি সক্রিয় ফেইসবুক, ইউটিউবসহ বেশ কিছু অনলাইন প্ল্যাটফর্মে। তার আলোচনার বিষয়বস্তু ব্যাপক। ধর্মীয়, সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিভিন্ন বিষয়ে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর অনেকগুলো প্রবন্ধ এবং লেকচার। হকের পক্ষে আপসহীন অবস্থানের কারণে গ্রেপ্তার হয়েছেন একাধিকবার।

পড়াশোনা

ড. কুনাইবী জর্ডান ইউনিভার্সিটি অফ সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি থেকে ফার্মাকোলজির ওপর গ্র্যাজুয়েশন করেন ১৯৯৭ এ। তারপর ২০০৩ এ একই বিষয়ের ওপর পিএইচডি করেন টেক্সাসের ইউনিভার্সিটি অফ হিউস্টন থেকে। কিছুদিন গবেষণামূলক কাজ করেন টেক্সাস মেডিক্যাল সেন্টারে। অ্যামেরিকায় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কাফিরদের অধ্যুষিত ভূমিতে থিতু না হয়ে ফিরে আসেন জর্ডানে। খণ্ডকালীন প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন জর্ডান ইউনিভার্সিটি অফ সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে। ফার্মাকোলজির ওপর ড. ইয়াদ আল কুনাইবীর বিভিন্ন গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন জার্নালে।

দ্বীনি শিক্ষা

ড. ইয়াদ কুনাইবী কুরআনের হাফিয। কুরআন তিলাওয়াতের ওপর ইজাযাহ অর্জন করেছেন শাইখ আব্দুর রাহমান বিন আলী আল মাহমুদের কাছ থেকে হাফস বিন আসিম রাহিমাহুল্লাহ এর সনদে। এ ছাড়া আলিমদের তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন করেছেন এবং ইজাযাহ অর্জন করেছেন ফিকহ, সীরাহ এবং তাফসীরশাস্ত্রে। ছাত্রজীবন থেকেই বিভিন্ন আলিম ও মুফাক্কিরের রচনা অধ্যয়ন করে আসছেন গভীর মনোযোগের সাথে। তাঁর চিন্তাকে যারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসি হাফিযাহুল্লাহ এবং উস্তাদ সাইয়্যিদ কুতুব রাহিমাহুল্লাহ।

আদর্শিক অবস্থান, দাওয়াহ ও অ্যাক্টিভিযম

ড. ইয়াদ কুনাইবী কোনো রাজনৈতিক দল বা ইসলামী সংগঠনের সদস্য হিসেবে পরিচিত নন। তিনি কুরআন-সুন্নাহ এবং সালাফ আস-সালেহিনের অবস্থানের আলোকে বর্তমান বাস্তবতার বিশ্লেষণ তুলে ধরেন, এবং সালাফ আস-সালেহিনের আকিদাহ ও মানহাজের দিকে আহ্বান করেন। ছাত্রজীবন থেকেই লেখালেখি, বয়ান এবং মসজিদকেন্দ্রিক দাওয়াতি কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। তাঁর লেখনী ও বয়ানে হক্বের পক্ষে আপসহীন অবস্থানের কারণে জর্ডানের স্বৈরাচারী সরকারের হাতে বন্দী হয়েছেন একাধিকবার। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জর্ডান সরকারের নীতি এবং ইস্রায়েলের সমালোচনা করায় এবং জর্ডানে ক্রমশ বাড়তে থাকা পশ্চিমা অবক্ষয়ের প্রভাব নিয়ে লেখার কারণে আবারও গ্রেপ্তার হন ২০১৫ এর ডিসেম্বরে। এ সময় তাঁকে সাড়ে তিন বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়, যা পড়ে কমিয়ে দুই বছর করা হয়।

সম্প্রতি

এত হয়রানির পরও ড. ইয়াদ তার দাওয়াহ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন। নিজ কমিউনিটির পাশাপাশি অনলাইন এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি সমান সক্রিয়। তার বিভিন্ন প্রবন্ধ, লেকচার ছড়িয়ে আছে ফেইসবুক, টুইটার, ইউটিউব এবং অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে। ড. ইয়াদ কুনাইবীর লেখনী ও বক্তব্যের আলোচনার বিষয়বস্তু বিস্তৃত। তিনি জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জতিক রাজনীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। আবার ইসলামের আলোকে সাম্প্রতিক ঘটনাবলি এবং সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা বিশ্লেষণও সমান গুরুত্ব পায় তাঁর আলোচনায়। তাঁর আলোচনাগুলোতে তিনি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন কুরআন ও সুন্নাহর অন্তর্নিহিত শিক্ষা ও আদর্শ জীবনে প্রয়োগের ওপর। ব্যক্তি-জীবন, পরিবার, সমাজ রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষা বাস্তবায়ন নিয়ে সমান গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেন তিনি।

ড. কুনাইবী তার দাওয়াতি কর্মকান্ড সম্পর্কে বলেন – 'আমার দাওয়াহর উদ্দেশ্য সৃষ্টির সামনে রাব্বুল আলামীনের বড়ত্ব তুলে ধরা, এবং মানুষকে শরীয়াহ এর আদল, ইনসাফ ও রাহমাহর অধীনে বসবাস করার দিকে আহ্বান করা। আমি যা কিছু বলি তার সবটুকুই হক্ব হবার দাবি আমি করি না, তবে আমি শপথ করেছি বাতিল বলা থেকে নিজেকে বিরত রাখার। আমি কোনো দলের সাথে যুক্ত নেই। আমার লেখা আর বক্তব্য ছাড়া আর কোনো কিছু আমার অবস্থানের প্রতিনিধিত্ব করে না।'

বিভিন্ন পরীক্ষা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ড. ইয়াদ কুনাইবী তার দাওয়াহ ও অ্যাক্টিভিযম অব্যাহত রেখেছেন। আমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করি, তিনি যেন তাঁকে সিরাতুল মুস্তাকীমের ওপর রাখেন। সত্যের ওপর অটল রাখেন।

ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট : www.al-furqan.org

জিপিএস

ধরুন, আপনি ঘুরতে বেড়িয়েছেন। হাতে অচেনা এক শহরের ম্যাপ। অথবা হাল আমলের বহুল ব্যবহৃত জিপিএস। যাচ্ছেন ছোটবেলার জিগরি দোস্তের সাথে দেখা করতে। ম্যাপ কিংবা জিপিএসের ওপর ভরসা আছে আপনার। আপনি জানেন, গন্তব্যে পৌঁছানোর পথ সেখানে ঠিকঠাক দেখানো আছে।

এখন আপনি কী করবেন?

আপনি দশ রাস্তা ঘুরবেন না। সবচেয়ে ভালো রুট খুঁজে বের করার জন্যে সময় নষ্ট করবেন না; বরং নিশ্চিন্তে জিপিএস ফলো করবেন। আর এভাবে অচেনা শহরের, অচেনা গলি থেকেও হারানো বন্ধুকে খুঁজে পেতে খুব একটা কষ্ট হবে না।

কিন্তু ম্যাপ বা জিপিএস সঠিক পথ দেখাচ্ছে কি না, তা নিয়ে যদি আপনার সন্দেহ থাকে? তাহলে কী হবে?

সে ক্ষেত্রে আপনি খুব একটা দ্রুত এগোবার সাহস করবেন না। সতর্কতার সাথে সামনে এগোবেন, থেমে থেমে। কিছুক্ষণ পরপর গাড়ি থামিয়ে পথচারীদের প্রশ্ন করবেন। আপনার মন থাকবে বিক্ষিপ্ত। আপনার গন্তব্য নিয়ে, কিংবা দেখা হলে বন্ধুকে কী বলে চমকে দেবেন, তা নিয়ে ভাবার ফুরসত হবে না। সময় কাটবে সংশয়, অস্থিরতা আর দুশ্চিন্তায়। কারণ, আপনি নিশ্চিত না আপনি সঠিক পথে আছেন কি না।

ওপরের উদাহরণের সাথে কুরআনের মিল কোথায় জানেন?

দেখুন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কী বলেছেন। তিনি বলেন :

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

যারা নিশ্চিত বিশ্বাস করে যে, তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ ঘটবেই এবং তাঁরই দিকে তারা ফিরে যাবে। [তরজমা, সূরা আল-বাক্বারা, ৪৬]

দ্বীন ইসলাম নিয়ে সন্দেহে ভোগা মানুষ কখনো নিজেকে নিয়ে, নিজের পথ নিয়ে নিশ্চিত হতে পারে না। সে সব সময় দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে,

'আসলেই কি আমি সঠিক পথে আছি?'

যখনই সে কোনো গুনাহ ছাড়ার চেষ্টা করে, শয়তান তাকে এসে বলে :

> 'তুমি কি জান্নাতের জন্য এ কাজটা ছাড়ছ? যদি জান্নাত বলে কিছু না থাকে? তাহলে তো এপার-ওপার সবই হারাবে। ভালোমতো ভেবে দেখো কিন্তু!'

কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি বিনীতভাবে আত্মসমর্পণ করেছে তাদের এ সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় না। এ কৌশলে শয়তান তাদের সাথে পেরে উঠতে পারে না।

দেখুন সূরা বাক্বারার এই আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলছেন,

> *'যারা বিশ্বাস করে...।'*

কুরআনে যখন يظنون (শাব্দিক অর্থ; 'ধারণা করা' অথবা 'মনে করা') এর ক্রিয়া আসে তখন এর দ্বারা 'ইয়াক্বিন' বা 'নিশ্চয়তা' বোঝায়। অর্থাৎ আল্লাহ ﷻ এখানে ওইসব বান্দাদের কথা বলছেন, যারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে তারা তাদের রবের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। এবং তাঁর কাছেই ফিরে যাচ্ছে। এমন মানুষেরা নিশ্চিত জানে যে আল্লাহ ﷻ এর সামনে দাঁড়িয়ে একদিন সব কাজের হিসেব দিতে হবে। সেদিন তিনি হয় জান্নাতের মাধ্যমে পুরস্কৃত করবেন অথবা শাস্তি দেবেন জাহান্নামের আগুনে।

একজন মানুষ যখন এ কথা বিশ্বাস করে, সে যখন এই সাক্ষাতের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যায়, তখন তাঁর জন্যে আন্তরিকভাবে ইবাদাত করা ও গুনাহ থেকে সরে আসা সহজ হয়ে যায়।

প্রিয় পাঠক, কোনো ইবাদাতের ব্যাপারে যখনি আলসেমি লাগবে, নিজেকে প্রশ্ন করবেন :

> আমি কি জান্নাতের জন্য অপেক্ষা করছি না?
>
> আমি কি জান্নাতের অস্তিত্ব নিয়ে নিশ্চিত না?
>
> আল্লাহর হুকুম মানাই যে জান্নাত পাওয়ার উপায় তা নিয়ে কি আমার মনে কোনো সন্দেহ আছে?

তাহলে কেন আমি অলসতা করছি? অবহেলা করছি?

কাজেই, নিজের ঈমানকে শক্ত করুন, সব সংশয়কে ছুড়ে ফেলে ছুটে যান আল্লাহর রাস্তায়। অনর্থক সংশয়, সন্দেহে সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই দশ রাস্তা ঘোরার। প্রয়োজন নেই অন্য পথ আর পদ্ধতি নিয়ে মাথা ঘামাবার। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে সাক্ষাতের সেই অসামান্য মুহূর্তের জন্যে প্রস্তুত করুন নিজের সমস্ত অন্তরাত্মাকে। যেমনটা আমাদের প্রিয়নবী ﷺ বলেছেন :

من خاف أَدْلَجَ، ومن أَدْلَجَ بلغ المنزلَ، أَلا إن سِلْعَةَ اللهِ غاليةٌ، أَلا إن سِلْعَةَ اللهِ الجنة

যে ব্যক্তি ভয় করে, সে সাহরীর আওয়্যাল ওয়াক্তে (প্রথম প্রহরে) সফর করে। আর যে ব্যক্তি সাওয়ারীর আওয়্যাল ওয়াক্তেই সফর করে সে তার মানযিলে পৌছে যায়। জেনে রাখ, আল্লাহর পন্য খুবই দামী। শোন, আল্লাহর পণ্য সামগ্রী হল জান্নাত। [১]

[১] সুনান আত তিরমিযী, ২৪৫০

কক্ষান্তরের প্রস্তুতি

গতকালের কথা। অফিসের একজন কর্মচারীকে দেখলাম হাতে ব্যান্ডেজ নিয়ে ঘুরছেন। আমি মজা করে বললাম,

'কী হে, কার সাথে মারামারি করে হাতে ব্যথা পেলে? তোমাকে না কতবার বলেছি রাস্তাঘাটে মারামারির অভ্যাসটা বাদ দিতে?'

'স্যার, মারামারি না...আমি মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি। প্রায় যান্ত্রিক গলায়' জবাব দিল সে।

অবাক হলাম। মানুষটার চোখগুলো স্থির হয়ে আছে। গলায় কাঁপনের সুর। যাই ঘটেছে তার ধাক্কা এখনো সামলে উঠতে পারেনি বেচারা, বোঝা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি ক্ষমা চেয়ে, জানতে চাইলাম কী হয়েছে।

দুর্বল গলায় বলতে শুরু করল লোকটা,

'এক মাস আগের কথা। বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ থেকে বাসায় লোক এসেছিল। কী জানি ওয়্যারিং এর সমস্যার কথা বললো। বাসার জানালার সামনে দিয়েই নতুন একটা তার টানল ওরা। যাওয়ার পর দেখলাম তারটা ঝুলে আছে জানালার সামনে। আমি ওটা শুধু একটুখানি উঠিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তারটা মাঝখানে ফাটা ছিল। ধরামাত্র বিদ্যুতের প্লাবন বয়ে গেল শরীরে।

এক মুহূর্তের জন্য চোখের সামনে আমার সব মৃত আত্মীয়, বন্ধুবান্ধবকে দেখতে পেলাম। তারপর সব অন্ধকার...'

সুবহানআল্লাহ। বারযাখের জীবনের খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিল মানুষটা। দুর্ঘটনার সাথে সাথে ছুটে আসে ওর স্ত্রী-সন্তানেরা। টেনেহিঁচড়ে সরিয়ে আনে ওকে। জানে বেঁচে গেলেও ওর হাতে রয়ে যায় বিদ্যুতের স্পর্শের ছাপ। দুর্ঘটনার এক মাস পর আজও

ওর বাম হাতের আঙুলে রয়ে গেছে ক্ষতচিহ্নগুলো। ও আমাকে আঙুলগুলো দেখাল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। লোকটার ভাগ্য ভালো, সাধারণত এসব ক্ষেত্রে আঙুল কেটে ফেলতে হয়। নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহর রহমত।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর চাপা গলায় আবার কথা বলো শুরু করল লোকটা...

'স্যার, আপনাকে একটা কথা বলি। কথাটা আর কাউকে বলিনি। ওইদিন ঘটনাটা ঘটে বিকেল ৪.১০ এ। আসরের আগে আগে। ঠিক এক ঘণ্টা বিশ মিনিট আগে আমি ছিলাম অফিসে। অফিস ছেড়ে বের হচ্ছিলাম। এক মহিলা; অফিসের সিঁড়ি পরিষ্কার করেন, আমার পথ রোধ করে দাঁড়ালেন। প্রশ্ন করলেন,

আপনি কি বাসায় যাচ্ছেন?

হ্যাঁ।

আমাকে একটু সাহায্য করুন। আপনার বাসায় তো খাবার আছে কিন্তু আমার বাচ্চাদের মুখে দেয়ার মতো এক মুঠো খাবার আমার কাছে নেই।

পকেটে দুই দিনার[২] ছিল, তার একটা উনার হাতে দিলাম।

মহিলার মুখ থেকে যেন ছায়া সরে গেল। খুশিমনে আমার জন্য দু'আ করলেন,

আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন, আপনার সম্পদ বাড়িয়ে দিন, আপনাকে হেফাযত করুন।

তারপর আমি বাড়ি ফিরে এলাম। তার কিছুক্ষণ পর এ ঘটনা ঘটল।'

কথা শুনতে শুনতে আমি লোকটার দিকে তাকাচ্ছিলাম। একেবারে সাধারণ একজন কর্মচারী। খুব কম বেতনের চাকরি করে। সেই মহিলার সাথে কথোপকথনের ঠিক এক ঘণ্টা বিশ মিনিট পর ওর দেখা হয়েছিল মৃত্যুর সাথে। আল্লাহ ﷻ তাঁকে হেফাযত করেছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ। সেই চিহ্ন আজও সে বয়ে বেড়াচ্ছে তার বাম হাতের আঙুলগুলোতে। যেন মৃত্যু ওর সাথে হাত মিলিয়ে গেছে, রেখে গেছে চিহ্ন। আল্লাহ ﷻ তাঁকে শিফা দান করুন।

হাদিসে এসেছে এবং অনেক উলামা এই হাদিসকে সহিহ বলেছেন,

صنائع المعروف تقي مصارع السوء

[২] জর্ডানের মুদ্রা। ১ দিনার সমান প্রায় ১২০ টাকা।

সৎকাজ অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করে।[৩]

প্রিয় পাঠক, আমরা তো কেউ জানি না এ দুনিয়াতে আর কত দিন আছি। একটা সময় ঠিক করা আছে, যখন আমাদের বিদায় নিতে হবে। সেই দিনের জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি আমাদের আছে কি? আসুন সাধ্যমতো নেক আমল করার চেষ্টা করি।

আর মনে রাখবেন কখনো মযলুমের দু'আকে তুচ্ছ মনে করবেন না, কারণ আমাদের রব সবকিছুর সাক্ষী।

---

[৩] আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৬৯

বন্দীর হিসেবখাতা

একজন বন্দীর চিন্তা আবর্তিত হয় নিচের শব্দগুলো ঘিরে।

বন্দীত্ব, মুক্তি, রায়, বিচারক, অভিযোগ, আত্মপক্ষ সমর্পণ, সাক্ষী, প্রমাণ, নির্দোষিতা, শাস্তি, শাস্তির মেয়াদ, শাস্তি লাঘব...

দাঁড়িয়ে বসে, শয়নে-স্বপনে, খাওয়া কিংবা পান করার সময়, ইবাদত অথবা অবসরের সময়, ঘুরেফিরে এ শব্দগুলো নিয়েই ব্যস্ত থাকে বন্দীর মন।

পত্রিকা পড়ার সময়, কিংবা খবর দেখার সময়, শুধু ওই খবরগুলোর দিকে তার মনোযোগ থাকে যেগুলো তার মামলা কিংবা জামিনের সাথে সম্পর্কিত।

নতুন নতুন ব্র্যান্ডের সেলফোন, গাড়ি কিংবা ফ্ল্যাটের বিজ্ঞাপন, নিত্যনতুন রগরগে গসিপ, স্বল্পবসনা মডেলদের চার রঙ্গা ছবি, কোনো কিছু টানে না তাকে। এগুলো নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই বন্দীর। যেন তার চোখেই পড়ে না।

প্রিয় পাঠক, এবার নিচের কথাগুলো নিয়ে একটু ভাবুন।

এ দুনিয়াতে আমরা এসেছি অল্প কিছু সময়ের জন্য। এক অর্থে আমরা এখানে আটকা পড়ে আছি। আমাদের আসল বাড়ি, আসল ঠিকানা জান্নাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। রাসূল ﷺ-এর হাদিসেও এসেছে,

> *'দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার আর কাফিরের জন্য জান্নাত।'*[৪]

দুনিয়ার কারাগারে বন্দী এই আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো হলো আমাদের গুনাহগুলো। সাক্ষীপ্রমাণ সব প্রস্তুত। এখন কেবল রায় দেয়ার অপেক্ষা। আত্মপক্ষ সমর্থনে আমাদের পক্ষে কেবল এটুকু আছে যে আমরা তাওহিদবাদী। আমরা আল্লাহর

---

[৪] সহিহ মুসলিম, আত-তিরমিযি, আন-নাসায়ি, ইবনু মাজাহ, ইবনু হিব্বান ও আহমাদ।

একত্বে বিশ্বাসী। আমরা মুওয়াহ্হিদ।

কাজেই আমাদের যদি তাওহিদে সমস্যা থাকে, তাহলে শাস্তি নিশ্চিত। আর সেই শাস্তির মেয়াদ নিয়ে প্রশ্ন করা অনর্থক।

মামলা খারিজ হবার একমাত্র উপায় আন্তরিক তাওবাহ।

আর যিনি রায় দেবেন, তিনি হলেন সমগ্র সৃষ্টির একচ্ছত্র অধিপতি, প্রকৃত বিচারক, আল্লাহ ﷻ।

তাই আমাদের সব মনোযোগ থাকা উচিত বিচারককে সন্তুষ্ট করা নিয়ে। আমাদের সব কাজের লক্ষ হওয়া উচিত দুনিয়ার এ কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে আখিরাতে জান্নাতে প্রবেশ করা।

ব্যস, এটাই লক্ষ্য।

দুনিয়ার তুচ্ছ, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ে নষ্ট করার মতো সময় আমাদের নেই। সুযোগ নেই এসব বিলাসিতার। এগুলো আমাদের মাথাব্যথা না। আমাদের একমাত্র চিন্তা হলো আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচা, তাঁকে সন্তুষ্ট করা এবং তাঁর কাছে পুরস্কৃত হওয়া।

আমাদের সব চিন্তাচেতনা, কথা, কাজ, সিদ্ধান্ত আবর্তিত হতে হবে এই লক্ষ্যগুলো ঘিরে। কোনোভাবে, কোনো অবস্থায়, কোনো কিছুর জন্যে এগুলো থেকে মনোযোগ সরানো যাবে না।

ইবনুল ক্বাইয়্যিম ﵀ বলেছেন,

> *চিরন্তন জান্নাতে এসো, যেখানে ছিল তোমার প্রথম নিবাস। সেখানেই তাঁবু খাটানো আছে তোমার জন্য। কিন্তু আজ আমরা বন্দী শত্রুর হাতে। কী মনে হয়? আমরা কি পারব নিরাপদে নীড়ে ফিরতে?*[৫]

হাদিসটি আবু হুরাইরা ﷺ, সালমান ﷺ, ইবনু উমার ﷺ, ইবনু আম্র ﷺ-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

[৫] ইবনুল ক্বাইয়্যিম ﵀, হাদিল আরওয়াহ ইলা বালাদিল আফরাহ, পৃ.১৯৫

মাপকাঠি

নারীপুরুষের মেলামেশার সীমানা কেমন হওয়া উচিত?

প্রশ্নটা নিয়ে ভালোই বিতর্ক শুরু হলো ক্লাসের মেয়েদের মধ্যে। মন পরিষ্কার থাকা, ভালো নিয়্যাত থাকা, উদ্দেশ্য ভালো হওয়া কি যথেষ্ট? নাকি শরীয়াহর দিকনির্দেশনা আর সীমারেখাও মেনে চলতে হবে?

'আমাদের বয়স তো এখনো কম', একজনকে বলতে শোনা গেল।

'কোন বয়সটা কম, কোনটা বেশি, সেটা কিসের ভিত্তিতে ঠিক হবে? ম্যাচিউরিটি এসেছে কি না সেটার মাপার মাপকাঠি কী? বরং প্রশ্ন হলো, আমরা কি এখন শরীয়াহর দৃষ্টিতে দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন? বালেগা?'

'যদি মন পরিষ্কার থাকে তাহলে ছেলেমেয়ের মেলামেশায় সমস্যা কী? এটা তো কোনো পাপ না! '

ঠিক-বেঠিক কে ঠিক করবে? সমাজ, সংস্কৃতি, প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র? নাকি শরীয়াহ?

'আরে তুই তো হুজুরনীদের মতো কথা বলছিস!'

বিতর্ক চলতেই থাকল।

বিষয়টা স্কুল প্রিন্সিপালের কানে গেল। তিনি ক্লাসে আসলেন। তবে আসার কারণটা ওদের বললেন না। ধীর পায়ে ক্লাসে ঢুকে প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন,

'আচ্ছা মেয়েরা বলো তো, এই টেবিলটা বড় না ছোট?'

'ছোট!', বলল একজন।

'না, বড়!' ওর কথার রেশ মিলিয়ে যাবার আগেই আরেকজন চেঁচিয়ে বলল ।

'আরে না, টেবিলটা মাঝারি সাইজের', সবজান্তার সুরে বলে উঠল তৃতীয়জন।

মুচকি হেসে প্রিন্সিপাল এবার প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা দেখি এখানেও একমত হতে পারছ না। একমত হতে হলে কী দরকার বলো তো?'

'ছোট আর বড়-র সংজ্ঞা। কতটুকু হলে ছোট, কতটুকু হলে বড়, সেটা জানতে হবে।'

'চমৎকার। আর সংজ্ঞার জানার পর কী দরকার?'

'একটা মাপকাঠি। যা দিয়ে মাপা যাবে, তুলনা করা যাবে।'

'সুন্দর বলেছ। এই কথাগুলো শুধু টেবিলের জন্য না; বরং আমাদের জীবনের সবক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যদি কোনো সংজ্ঞা ঠিক করা না থাকে, কোনো পার্থক্যকারী না থাকে এবং কোনো মাপকাঠি না থাকে, তাহলে কোনোদিন, কোনো কিছুতেই আমরা একমত হতে পারব না। এখন প্রশ্ন হলো, কোন সেই মাপকাঠি, যা দিয়ে আমরা বিচার করব? মাপব?'

'সমাজ, সংস্কৃতি, রীতিনীতি',

'কিন্তু যখন সংস্কৃতি আর সমাজের রীতিনীতি বদলে যাবে?'

জবাব দিল না মেয়েটা।

'আমাদের বাবা-মা যা করবেন, যা শেখাবেন সেটাই আমাদের মাপকাঠি', আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল আরেকজন।

'কিন্তু বাবা-মা যদি একমত হতে না পারে? যদি তারাও তোমাদের মতো তর্ক শুরু করে?'

দ্বিতীয় মেয়েটাও চুপ হয়ে গেল।

'বিবেক।'

'সব মানুষের বিবেক কি একরকম?'

'না।'

'তাহলে কার বিবেককে আমরা মাপকাঠি হিসেবে নেব?'

এবার তৃতীয় মেয়েটাও চুপ।

'যুক্তি?', ঠিক উত্তর না, অনেকটা প্রশ্নের মতো শোনাল এবার।

'কিন্তু যেটা তোমার কাছে যৌক্তিক সেটা তো আরেকজনের কাছে যুক্তিসম্মত নাও মনে হতে পারে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা এই যে তোমরা বলছ, সংস্কৃতি, সামাজিক রীতিনীতি, পিতামাতা, বিবেক, যুক্তি ইত্যাদিকে মাপকাঠি হিসেবে নিতে, তোমরা কি নিশ্চিত এগুলো তোমাকে সঠিক উত্তরটা দিতে পারবে?'

এবার পিনপিতন নীরবতা নেমে এল ক্লাসে। সবাই ভাবছে।

যে মেয়েটাকে হুজুরনী বলা হচ্ছিল এবার সে মুখ খুলল। অনুচ্চ, শান্ত কিন্তু নিশ্চিত গলায় বলল,

'শরীয়াহ। মাপকাঠি হবে আল্লাহ ﷻ-এর দেয়া শরীয়াহ।'

'ঠিক! মাপকাঠি হলো শরীয়াহ। শোনো মেয়েরা, আমরা মুসলিম। আর মুসলিম হবার অর্থ কী? এর অর্থ হলো আমরা প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহর সিদ্ধান্তের কাছে নিজেদের সমর্পণ করি। আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী উক্ত নির্দেশের ভিন্নতা করার কোনো অধিকার রাখে না। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে সে স্পষ্টতই সত্য পথ হতে দূরে সরে পড়ল। [তরজমা, সূরা আল-আহযাব, ৩৬]

এবং তিনি ﷻ বলেন,

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

আর যেকোনো বিষয়েই তোমরা মতবিরোধ কর, তার ফয়সালা আল্লাহর কাছে; তিনিই আল্লাহ, আমার রব; তাঁরই ওপর আমি তাওয়াক্কুল করেছি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী হই। [তরজমা, সূরা আশ-শূরা, ১০]

এবং তিনি ﷻ বলেন,

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

যদি কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সেই বিষয়কে আল্লাহ এবং রাসূলের (নির্দেশের) দিকে ফিরিয়ে দাও যদি তোমরা আল্লাহ এবং আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাকো; এটাই উত্তম এবং সুন্দরতম মর্মকথা। [তরজমা, সূরা আন-নিসা, ৫৯]

শোনো মেয়েরা, মানুষ ভুল করে। আমাদের ভুল হয়ে যায়। আমরা হয়তো সব সময় শরীয়াহর বিধান মেনে চলতে পারি না। ভুল হওয়াটা সমস্যা না। কিন্তু আমাদের স্পষ্টভাবে মনে রাখতে হবে আমরা যা করছি সেটা ভুল। শরীয়াহর বিধান সঠিক। আমি হয়তো কোনো একটা ক্ষেত্রে সেটা পালন করতে পারিনি, কিন্তু আমার স্বীকার করতে হবে যে আমি যা করছি সেটা ভুল। শরীয়াহ যা ঠিক করে দিয়েছে সেটাই ঠিক।'...

আল্লাহ ﷻ এই উম্মাহর মধ্যে এমন শিক্ষকের সংখ্যা বাড়িয়ে দিন, যারা আমাদের সন্তানদের শরীয়াহর কর্তৃত্ব সম্পর্কে শেখাবে এবং শরীয়াহকে গ্রহণ করতে শেখাবে একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে।

গাঁজা ও গণতন্ত্র

১৯২৩ থেকে শুরু করে ৯৫ বছর কানাডায় গাঁজা নিষিদ্ধ ছিল। তারপর ২০১৮ এর ১৬ই অক্টোবর জনমতের ভিত্তিতে গাঁজাকে বৈধ করা হয়। ৯৫ বছর পর মানুষ এখন স্বাধীন। মনোরঞ্জনের জন্য এখন সে গাঁজা খেতে পারবে নির্বিঘ্নে, নিশ্চিন্তে। অধিকাংশের খেয়ালখুশি অনুযায়ী গাঁজা আজ বৈধ।

এর মাধ্যমে উরুগুয়ের পর দ্বিতীয় রাষ্ট্র হিসেবে গাঁজা বিক্রি বৈধতা পেল কানাডায়।

বিকেলের খবরে দেখা গেল মানুষ দল বেঁধে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে গাঁজা কেনার জন্যে। প্রথম "বৈধ' গাঁজা ক্রেতাকে ঘিরে ছোটখাটো একটা উল্লাসও হয়ে গেল। যেন কত বড় এক বিজয় অর্জিত হলো!

অথচ অল্প কিছুদিন আগেও জীবন, মন এবং নৈতিকতার ওপর গাঁজার ক্ষতিকর প্রভাবের কথা বিবেচনা করে একে নিষিদ্ধ রাখা হয়েছিল। গাঁজাসহ কেউ ধরা পড়লে তাকে শাস্তি দেয়া হতো অপরাধী হিসেবে। কিন্তু আজ মনোরঞ্জনের জন্য গাঁজা খাওয়া বৈধ। কফি কিংবা চকলেটের মতোই এখন গাঁজা কেনাবেচা হবে। যেন এটা খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। কারণ, অধিকাংশ মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে গাঁজাকে বৈধতা দেয়ার।

প্রিয় পাঠক, এই হলো গণতন্ত্র। সত্য, মিথ্যা, হক-বাতিল, ভালো-মন্দের সাথে কোনো সম্পর্ক এর নেই। এর কোনো সম্পর্ক নেই হালাল-হারামের সাথে।

গণতন্ত্রে কখনো গাঁজা হালাল হবে, কখনো পুরুষে পুরুষে বিয়ে। কখনো ছেলে থেকে মেয়ে আর মেয়ে থেকে ছেলে হবার জন্য উন্মাদের মতো দেহ কাটাছেঁড়ার নাম দেয়া হবে অধিকার। কারণ, গণতন্ত্রের মাপকাঠি হলো অধিকাংশের মত। অধিকাংশ যা চাইবে তা-ই আইন।

আর অধিকাংশের মত কারা ঠিক করে দেয়?

কারা আবার! যারা মিডিয়া আর বড় বড় কর্পোরেশানগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। যারা প্রপাগ্যান্ডা এবং বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে মানুষের কামনা-বাসনা উস্কে দেয়। যারা মানুষের চাহিদা, লোভ আর খেয়ালখুশিকে নিয়ন্ত্রণ করে, তারাই তো!

তারা অধিকাংশকে শেখায় গাঁজার ধোঁয়ায় বাস্তবতাকে ভুলে থাকতে। আর অধিকাংশ যখন একে নিজেদের স্বাধীনতা মনে করে উল্লাস করে, তখন তাদের বুদ্ধি, বিবেচনা, নৈতিকতা আর সম্মানের বিনিময়ে ভারী হয় পুঁজিবাদীর পকেট। যতই জনগণের সার্বভৌমত্বের কথা বলা হোক, বাস্তবতা হলো এ ব্যবস্থায় অধিকাংশ মানুষ হলো গোলাম। অল্প কিছু মানুষ ছড়ি ঘোরায় বাকিদের ওপর। কখনো মুলো কখনো চাবুক দিয়ে যেদিকে ইচ্ছে সেদিকে চালায় তাদের। সবচেয়ে মজার ব্যাপারটা হলো, গোলামি করা মানুষগুলো নিজেদের স্বাধীন মনে করে। নেশাগ্রস্তের মতো পরাবাস্তব কোনো জগতে ঘুরপাক খেতে থাকে তাদের চিন্তা। দাসত্বের শেকলগুলো ওরা চিনতে পারে না; বরং দাসত্বকেই আঁকড়ে ধরে মুক্তি আর অধিকার মনে করে।

শেকলে বাঁধা স্বাধীনতা

প্রজারা যতক্ষণ মুক্তি কিংবা বিদ্রোহের ব্যাপারে বেখবর থাকে, ততক্ষণ নাচগান, মদ আর মাংস নিয়ে তাদের উন্মাদনায় বাগড়া দেয় না রাজা। বরং সস্তা সুখ নিয়ে গোলামদের ব্যস্ততার সুযোগে নির্বিঘ্নে ছিনিয়ে নেয় তাদের সম্মান আর মানবতা।

এই হলো আজকের আধুনিক প্রজাদের 'মুক্তি' আর 'অধিকার' এর বাস্তবতা। অধিকার আর স্বাধীনতা হলো ওইসব সস্তা সুখ আর সাময়িক বিনোদন কেনার সক্ষমতা, যা দাসত্বকে টিকিয়ে রাখে। দীর্ঘায়িত করে।

এ এক শেকলে বাঁধা স্বাধীনতা।

রাজারা জনগণের ধনসম্পদ, সহায়-সম্বল 'বৈধভবে' লুট করে। দেনার বোঝা কাঁধে নিয়ে আত্মহত্যা করে মানুষ। শেয়ারবাজারে সর্বস্ব হারিয়ে ঝাপসা চোখে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে মধ্যবিত্ত। বাধ্য হয়ে ডাস্টবিনে কুকুরের পাশে উবু হয়ে বসে খাবারের খোঁজ করে শিশু। বেকার হয়ে ডিগ্রি হাতে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় যুবক। নিজ ভিটে থেকে বিতাড়িত হয় কৃষক। পঙ্গু হয়ে যায় অর্থনীতি। কাল যে সম্মানিত ছিল আজ সে হয় লাঞ্ছিত।

অন্যদিকে রাজা আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা গাড়ি-বাড়ি, পোশাক থেকে শুরু করে খাবার-দাবার, এমনকি হাতঘড়ির পেছনেও ওড়ায় কোটি কোটি টাকা।

এই রাজারাই মুসলিম উম্মাহর ধন-সম্পদ তুলে দেয় উম্মাহর শত্রুদের হাতে। লুট করা সেই টাকা দিয়ে বানানো মিসাইলের আঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয় মুসলিম শিশুদের দেহ।

এই হলো আমাদের আজকের বাস্তবতা।

দুরবস্থার এই সময়ে প্রজাদের কী দেয় রাজারা? গোলামকে শান্ত করতে কী দেয় মনিব?

মনিব তার গোলামদের 'স্বাধীনতার সীমানা' বাড়িয়ে দেয়।

কেমন স্বাধীনতা জানেন?

গোলাম চাইলে ইচ্ছেমতো নাচতে পারবে, গাইতে পারবে, মাতাল হবে, নগ্ন হবে। যখন ইচ্ছে যার সাথে ইচ্ছে শোবে, নেশা করবে। সব সীমালঙ্ঘন করবে, দ্বীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে।

এভাবে স্বাধীনতার তোড়ে দিন দিন বাড়বে ওদের পরাধীনতা। গোলামের গায়ে আরও শক্ত হয়ে চেপে বসবে শেকলের বাঁধন।

এ এক অদ্ভুত স্বাধীনতা, জনগণের নতুন আফিম।

কৌশলটা চমৎকার। আমরা এক ঢিলে দুই পাখি মারার কথা বলি। এই কৌশলে এক ঢিলে তিন পাখি মারা পড়ে:

১। শোষিত, নির্যাতিত জনগণ চেপে রাখা আবেগ, কষ্ট, ক্ষোভ উগড়ে দেয়ার একটা পথ পায়। তারা বিদ্রোহ করে। তবে শোষকের বিরুদ্ধে না। তারা বিদ্রোহ করে ওই দ্বীনের বিরুদ্ধে, যা তাদের মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে।

২। 'স্বাধীনতা' নামের আফিম দিয়ে অনুভূতির দেয়াল অবশ করে ছিনিয়ে নেয়া হয় মানুষের মুক্তি ও সম্মান। ছিনিয়ে নেয়া হয় যুলুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সবচেয়ে বড় চালিকাশক্তি— দ্বীন। মুক্তি, সম্মান ও দ্বীন হারিয়ে মানুষ পরিণত হয় নফস আর কামনা দ্বারা চালিত পশুতে। যাকে নিশ্চিন্তে গোলামির বাঁধনে আজীবন আটকে রাখা যায়।

৩। রাজা আর প্রজা দুজনেই আন্তর্জাতিক ক্রুসেইডার-যায়োনিস্ট শাসকগোষ্ঠীর গোলাম থেকে যায়।

প্ল্যানটা প্রায় নিখুঁত বলা চলে। তবে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার একটা শর্ত আছে। আগে সরিয়ে দিতে হবে এতে বাগড়া দেয়ার মতো সব মানুষগুলোকে। ওইসব মানুষগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে যারা সাহাবী রিবি' ইবনু আমর ﷺ-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে মানুষকে বলে,

> আল্লাহ আমাদের পাঠিয়েছেন, মানুষকে সৃষ্টির দাসত্ব থেকে স্রষ্টার দাসত্বে নিয়ে আসতে। সমস্ত বাতিল ধর্মের জুলুম থেকে মানুষকে মুক্ত করে দ্বীন ইসলামের ইনসাফের দিকে আনতে। এবং দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে দুনিয়া ও

আখিরাতের প্রশস্ততার দিকে নিয়ে যেতে।[৬]

একবার এমন চিন্তা করা, এমন কথা বলা মানুষগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারলে নিশ্চিন্তে বাস্তবায়ন করা যাবে মাস্টারপ্ল্যান। সবাইকে সস্তা সুখের উল্লাসে ব্যস্ত রেখে লুটে নেয়া যাবে মানবজাতির দুনিয়া ও আখিরাত। তাই আজ আন্তর্জাতিক শাসকগোষ্ঠী আর আঞ্চলিক রাজাদের প্রথম টার্গেট এই মানুষগুলো। সব অস্ত্র তাক করা তাদের বুকে। সব প্রপাগ্যান্ডার তীর তাদের দিকে। তাঁদেরই থামাতে মহাসমারোহের আয়োজন।

[৬] ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭/৪৩-৪৪

মিডিয়া

অভিশপ্ত আর বিতাড়িত হওয়ার পর ইবলিসের ধ্যানজ্ঞান হয়ে দাঁড়ায় মানুষকে সীরাতুল মুস্তাকীম থেকে বিচ্যুত করা। যত বেশি সম্ভব বনী আদমকে নিজের সাথে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করে হিংসা আর বিদ্বেষের আগুনে নিয়ত জ্বলতে থাকা ইবলিস।

قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلً

সে (ইবলিস) বলল, 'দেখুন, এ ব্যক্তি, যাকে আপনি আমার ওপর সম্মান দিয়েছেন, যদি আপনি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সময় দেন, তবে অতি সামান্য-সংখ্যক ছাড়া তার বংশধরদের অবশ্যই পথভ্রষ্ট করে ছাড়ব।' [তরজমা, সূরা বনী ইসরাইল, ৬২]

মানুষের মধ্যে ইবলিসের কিছু অনুসারী আছে, যারা হুবহু একই কাজ করে।

ওদের যৌনাকাঙ্ক্ষা বিকৃত। তাই মুসলিম যুবক-যুবতীদের যখন পবিত্রতা বজায় রাখতে দেখে, তখন সহ্য করতে পারে না ওরা।

আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে আমাদের এ ধরনের মানুষের কথা জানিয়েছেন। যেমন লূত ﷺ ও তাঁর অনুসারীদের তাঁদের সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেছিল,

أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ

তাদের তোমরা তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। নিশ্চয় তারা এমন লোক, যারা অতি পবিত্র হতে চায়।'[তরজমা, সূরা আল আ'রাফ, ৮২]

এধরণের মানুষ আজও আছে। শয়তানের এই অনুসারীরা চায় অন্যেরাও তাদের মতো অধঃপতিত হোক। অপবিত্র হোক। মানুষকে যিনা, ব্যভিচার আর যৌন বিকৃতির দিকে

ঠেলে দেয়ার জন্য ওরা হাজির হয় গান, সিনেমা আর পর্নোগ্রাফির সম্ভার নিয়ে। হরেক রকম অশ্লীলতার পসরা সাজিয়ে, ফেরি করে বেড়ায় নিরন্তর। যাতে যুবক-যুবতীদের কামনা জেগে ওঠে, কুপ্রবৃত্তি শক্তিশালী হয় এবং তাঁরা সীমালঙ্ঘন করে।

মহান আল্লাহ ﷻ বলেন,

وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا

...আর যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায় যে, তোমরা প্রবলভাবে (সত্য পথ থেকে) বিচ্যুত হও। [তরজমা, সূরা আন-নিসা, ২৭]

ইবলিসের মতোই ওরা নিজেরা বিচ্যুত এবং অন্যদেরও বিচ্যুত করতে চায়। ওরা নিজেরা নষ্ট, অন্যকেও নষ্ট করতে চায়। ওরা মানসিকভাবে অস্থির, অসুস্থ, ভারসাম্যহীন। তাই ঈমানদারের অন্তরের প্রশান্তি আর চোখের শীতলতা ওরা সহ্য করতে পারে না।

মৃত্যুর পর কী আছে, কী হবে—এ নিয়ে ওরা দুশ্চিন্তায় ভোগে।

যদি দুনিয়ার এ জীবনটার ওপারে কিছু না-ই থাকে, তাহলে বেঁচে থাকার অর্থ কি শুধু ঘুম, খাওয়া, যৌনতা, প্রাকৃতিক কর্ম সারা আর তারপর মরে যাওয়া?

চিন্তাগুলো ওদের অন্তরের অন্ধকারকে আরও গাঢ় করে।

আমাদের আখিরাতের জন্য কাজ করতে দেখলে ওদের রাগ বেড়ে যায়। ওদের কুঁড়ে-কুঁড়ে খায় অন্ধ ক্রোধ।

মহান আল্লাহ ﷻ বলেন,

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً

তারা চায় যে, তারা নিজেরা যেমন কুফরী করেছে, তোমরাও তেমনি কুফরী করো, যাতে তোমরা তাদের সমান হয়ে যাও। [তরজমা, সূরা আন-নিসা, ৮৯]

ভেতরে ভেতরে ওরা জানে, তুমি সত্যের অনুসারী আর ওরা মিথ্যের। কিন্তু তবু ওদের অনুশোচনা নেই। ওরা তাওবাহ করতে চায় না। আত্মসমর্পণ করতে চায় না আসমান-যমীনের মালিকের কাছে; বরং ওরা তোমাকেও নামিয়ে আনতে চায় ওদের কাতারে। যেন তুমিও ওদের মতো কলুষিত হও। যেন ওদের আর নিজেদের নিকৃষ্ট মনে না হয়।

ইবলিস জানে সে জাহান্নামে যাবে। কিন্তু সে জাহান্নামে একা থাকতে চায় না।

ওরাও চায় না।

ওরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

তাই ওদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং নিজের দৃষ্টি অবনত করো। গ্রহণ করো ঈমান ও হিদায়াতের শ্রেষ্ঠত্ব।

وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ

...আর যারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে না তারা যেন তোমাকে অস্থির করতে না পারে।
[তরজমা, সূরা আর-রূম, ৬০]

বিশ্বকাপ তো শেষ হলো, তারপর?

ফুটবল বিশ্বকাপের সময় টিভির সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে মানুষ। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে থাকে পর্দার দিকে। এক মাস কিংবা তারও বেশি সময় ধরে মানুষের রুটিন আবর্তিত হতে থাকে বিশ্বকাপকে ঘিরে। পত্রিকাগুলো খুব ঘটা করে এই কর্মকাণ্ডকে পরিচয় করিয়ে দেয় 'বিশ্বকাপ উন্মাদনা' বলে। আসলেই এ এক উন্মাদনা।

এই উন্মাদনা নিয়ে কিছু কথা বলা দরকার।

আমি কাউকে দোষারোপ করব না। কারও সমালোচনা করব না। বিশ্বকাপের লাভক্ষতি বিশ্লেষণও আমার উদ্দেশ্য না। আমি কেবল ভবিষ্যতের জন্যে ছোট্ট একটা বার্তা দিতে চাই।

আমার ভাইয়েরা, বলুন তো, আমাদের কি নিষ্ক্রিয় দর্শকের সারি থেকে উঠে সক্রিয় হবার সময় আসেনি? আমাদের কি সময় আসেনি অনুসারী হবার বদলে কর্মী হবার? টিভি-পর্দার সামনে বসে থাকা দর্শক যাই করুক না কেন, খেলার মোড় তাতে বদলায় না। দর্শক খেলার ফলাফলকে প্রভাবিত করতে অক্ষম। তার কাজ শুধুই দেখে যাওয়া আর নিজের আবেগ খরচ করা। আপনি যতদিন দর্শকের সিটে থাকবেন ততদিন আপনি নিষ্ক্রিয়, অক্ষম। কিন্তু যারা আল্লাহর ওপর ভরসা করে তাঁর সৈনিকে পরিণত হয়ে যায়, তারা অক্ষম না। তারা ঘুড়িয়ে দিতে পারে ময়দানের খেলার মোড়। বদলে দিতে পারেন ইতিহাস।

হাফপ্যান্ট পরা কোনো এক পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ট্রফি উঁচিয়ে ধরলে আজ আমরা বসে বসে হাততালি দিই। কিন্তু আমাদের কি এমন কিছু করা উচিত না, যাতে করে কিয়ামতের দিন আমরা গর্বভরে আমাদের আমলনামা তুলে ধরতে পারি? বলতে পারি,

...فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ﴿١٩﴾ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ

...নাও! আমার আমলনামা পড়ে দেখো! আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আমি আমার হিসাবের সম্মুখীন হব। [তরজমা, সূরা আল-হাক্কা, ১৯-২০]

এবং সেইদিন পুরস্কৃত হতে পারি?

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٢١﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ

সুতরাং, সে সন্তোষজনক জীবনে থাকবে। সুউচ্চ জান্নাতে, তাঁর ফলসমূহ নিকটবর্তী থাকবে। তাঁকে বলা হবে, বিগত দিনসমূহে তোমরা যা সামনে পাঠিয়েছ, তাঁর বিনিময়ে তোমরা তৃপ্তি-সহকারে খাও ও পান করো! [তরজমা, সূরা আল-হাক্কা, ২১-২৪]

আল্লাহর নামে বলছি, ওপরের আয়াতগুলো আরেকবার পড়ুন। 'আর্জেন্টিনা জিতেছে', 'ব্রাজিল জিতেছে', 'ফ্রান্স জিতেছে', 'আমার দল জিতেছে', এসব কথার সাথে ওপরের আয়াতের বক্তব্যের একটু তুলনা করার চেষ্টা করুন তো। আদৌ কি কোনো তুলনা হয়?

কী ফেলে রেখে কিসের পেছনে ছুটছি আমরা?

আচ্ছা আপনার টিম জিতেছে, বুঝলাম। তাতে কী হয়েছে? তাতে কার কী আসে-যায়? পরের ধাপ কী? আপনার টিম জেতার পর কী হবে?

সত্যি বলতে কি, আমি নিজে খেলাধুলা পছন্দ করি। ফুটবল আমার পছন্দের খেলা। খুব একটা ভালো খেলতে না পারলেও, নিয়মিত খেলার চেষ্টা করি। আমি খেলি ব্যায়ামের জন্য। আর আমার বাকি সময় কাজে লাগানোর চেষ্টা করি। চেষ্টা করি উপকারী কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে।

ফুটবলের প্রতি বিশেষ কোনো ঘৃণা বা বিদ্বেষ নিয়ে আমি কথা বলছি না। আমি শুধু প্রশ্ন করছি, আমাদের কি এখনো মাঠের বলগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকার সময় আছে? এখনো কি সময় আসেনি খেলার মাঠ থেকে মনোযোগ সরিয়ে বিশ্বের সমস্যাগুলো সমাধানের দিকে মনোযোগ দেয়ার? আল্লাহ ﷻ কি এ জন্যই আমাদের পাঠাননি?

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, যাদের মানুষের জন্যে বের করা হয়েছে...। [তরজমা, সূরা আলে-ইমরান, ১১০]

আপনি হয়তো বলবেন, এত বড় বড় স্বপ্ন দেখার সময় আপনার নেই। এগুলো অবাস্তব চিন্তা।

মোটেই না! আল্লাহর কসম! আপনি যদি আল্লাহর ওপর ভরসা করে নিজের সাধ্যমতো চেষ্টা করেন, তাহলে আল্লাহ ﷻ আপনার কাজে এমন বারাকাহ দেবেন, যা আপনি কল্পনাও করেননি।

একবার চিন্তা করে দেখুন। আল্লাহ বলছেন আমরা সর্বোত্তম জাতি, যাদের মানবজাতির কল্যাণের জন্য পাঠানো হয়েছে। কিন্তু আজ আমরা নিজেদের সীমাবদ্ধ করে রেখেছি দর্শকের কাতারে। আমাদের সময়, আবেগ, চিন্তা কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে এমন সব টুর্নামেন্টের পেছনে, যেগুলো না মানবজাতির কোনো উপকারে আসে আর না এতে কারও দুঃখ-দুর্দশা দূর হয়। আমাদের কি সময় আসেনি সর্বোত্তম প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার? এখনো কি সময় আসেনি পৃথিবীর বুকে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিযোগিতা করার? চিরসুখের অধিকারী কিন্তু হবে সত্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট মানুষগুলোই।

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

তোমরা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হও, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের প্রশস্ততার মতো।... [তরজমা, সূরা আল-হাদীদ, ২১]

আমেরিকায় কৌফম্যান ফাউন্ডেশন নামে একটা প্রতিষ্ঠান আছে। এরা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে দু-বছরের একটা কোর্স করায়। কোর্স ফী ৭২ হাজার ডলারের আশেপাশে। প্রায় ৬১ লাখ টাকা।

এই আকাশচুম্বী ফী সত্ত্বেও অনেকে এই কোর্সগুলো করে। অনেক মুসলিমও করে।

এত টাকা, এত সময় শুধু একটা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কোর্সের জন্য।

বলুন তো, উম্মাহর প্রজেক্ট, সমগ্র মানজাতির মুক্তি ও আখিরাতের নিরাপত্তার জন্য যে প্রকল্প তার জন্য কতটুকু সময়, শ্রম আর অর্থ ব্যয় করা উচিত?

যে প্রজেক্টের উদ্দেশ্য উম্মাহর পুনর্জাগরণ, মানবজাতির মাঝে নিজেদের অগ্রবর্তী ভূমিকা খুঁজে নেয়া, যে প্রজেক্টের উদ্দেশ্য আল্লাহর যমিনে তাঁর দ্বীনের প্রতিষ্ঠা করা এবং এর মাধ্যমে মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনকে কল্যাণ ও বরকতময় করা—তাঁর জন্য আমরা কতটুকু সময় দিচ্ছি?

'আমাদের ধর্ম সব দিক বিবেচনা করে', 'ইসলাম এত কঠিন না', 'ইসলাম যুক্তিসম্মত',

'ইসলাম সব যুগে প্রযোজ্য', এ ধরনের অনেক কথাই তো আমরা বলি। কিন্তু এসব কথা দিয়ে আমরা আসলে কী বোঝাতে চাই? আমরা কি এ কথাগুলো বলে নিজেদের গাফেলতিকে জায়েজ করি? নিজেদের সান্ত্বনা দিই?

বিজয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ আমাদের নবী ﷺ গ্রহণ করেছিলেন। পরিকল্পনা, কঠোর পরিশ্রম, ব্যালেন্স, অগ্রাধিকার ঠিক করা, প্রতিপক্ষের ওপর আদর্শিক আক্রমণ, ভালো নিয়্যাত, বিশ্বাসীদের উদ্বুদ্ধ করা—কোনো কিছু তিনি বাদ রাখেননি।

আমরা কী করছি?

আল্লাহ ﷻ বলেন,

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

আর তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে, যার পরিধি আসমানসমূহ ও যমীনের সমান, যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। [তরজমা, সূরা আলে-ইমরান, ১৩৩]

আমার ভাইয়েরা, একটা ছোট্ট হিসেব করে দেখুন। নিজেকে প্রশ্ন করুন,

বিশ্বকাপ কিংবা অন্য কোনো খেলার পেছনে আমি মাসে কত সময় খরচ করেছি?

১০ ঘণ্টা? ২০ ঘণ্টা? ৩০ ঘণ্টা? ৫০ ঘণ্টা?

ঠিক আছে। কুরআনে আল্লাহ ﷻ যে প্রতিযোগিতার কথা বলেছেন, তার পেছনে আমি কতটুকু সময় দিয়েছি? আমার কতটুকু সময় দেয়া উচিত?

একবার নিজের সাথে সৎ হয়ে এ প্রশ্নের উত্তর খুজুন...

আসুন, আমরা এই অভিযাত্রায় একসাথে শামিল হই, ইলম দাওয়াত এবং কাজের মাধ্যমে।

হ্যাঁ, ইসলাম বিজয়ী হবে। কিন্তু...

কথাগুলো আমরা সবাই শুনেছি। যখনই কোনো কাফের রাষ্ট্র বা মুরতাদ শাসক ইসলামের বিরুদ্ধে নতুন কোনো যুদ্ধ শুরু করে, কেউ-না-কেউ বলে ওঠেন,

নিঃসন্দেহে ইসলাম বিজয়ী হবে।

আল্লাহু আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর

তারা যা-ই করুক না কেন, কখনোই আল্লাহর দ্বীনের আলোকে নেভাতে পারবে না।

ওপরের প্রতিটি কথা সত্য। কোনো সন্দেহ নেই। সহিহ হাদিসে এ উম্মাহর বিজয়ের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। হাদিসে এমন-সব বিজয়ের সুসংবাদ এসেছে, যা এখনো অর্জিত হয়নি। আমরা সেই বিজয়ের জন্য অপেক্ষা করছি। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ﷻ তাঁর এ দ্বীনকে বিজয়ী করবেন। ইসলামের বিরুদ্ধে আজ যারা চক্রান্ত করছে দুনিয়াতে তাদের স্থান হবে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে, আর আখিরাতে জাহান্নামের আগুনে। এক মুহূর্তের জন্যেও এ নিয়ে আমরা কোনো সন্দেহ করি না।

হ্যাঁ, ইসলাম বিজয়ী হবে। প্রশ্নটা এখানে না। প্রশ্ন হলো,

বিজয় যখন আসবে, তখন তুমি বা আমি কোথায় থাকব? আমাদের অবস্থান কোথায় হবে? আমরা কি বিজয়ী কাফেলার অংশ হব? নাকি আমাদেরও জায়গা হবে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে?

আমরা যারা এ ধরনের কথাগুলো বলি, তাদের মনোভাব অনেকটা এমন যে, ইসলাম বিজয়ী হলেই বুঝি আমাদের সব সমস্যা দূর হয়ে যাবে।

না; বরং এমনও হতে পারে যে ইসলামের বিজয় আপনার জন্য সমস্যা হয়ে দেখা দেবে। কারণ, বিজয়ের আগে আসে পরীক্ষা। আর আপনি নিজেকে এবং নিজের

সন্তানদের এই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করেননি। কাজেই পরীক্ষা আসলে আপনি ফেইল করে বসবেন। সত্যের কাফেলাকে বাদ দিয়ে যোগ দেবেন বাতিলের দলে। এ সম্ভাবনা কি উড়িয়ে দেয়া যায়?

আজ মসজিদে যেতে যেতে আমরা যখন ইসলামের বিজয়ের কথা বলছি, তখন আমাদের বাসাতেই আমাদের সন্তানেরা হয়তো আত্মিক কোমায় চলে গেছে। মরে গেছে তাদের অন্তরগুলো। প্রতিটি দিনের সাথে সাথে তারা চলে যাচ্ছে ইসলাম থেকে, মুসলিম পরিচয় থেকে আরও দূরে। ইসলামের শত্রুদের জন্য তাদের চিন্তা ও মন উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। শত্রুরা সেগুলো বোঝাই করছে কামনাবাসনা, প্রবৃত্তির অনুসরণের সবক আর দ্বীনের ব্যাপারে সংশয়-সন্দেহ দিয়ে। কথাবার্তা, পোশাক, আচরণ—প্রতিটি জিনিসে তারা অনুকরণ করছে পশ্চিমের। মোবাইল হাতে ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন, নিজেদের মাথায় মজুদ করছে হরেক রকমের জঘন্য আবর্জনা।

আপনি কীভাবে আশা করেন চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হবার পর তাদের অন্তরে হঠাৎ ঈমানের প্লাবন শুরু হবে? আপনি কীভাবে আশা করেন তীব্র লড়াইয়ের সময় সত্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে তারা প্রস্তুত থাকবে?

তাদের অন্তরে তো শুধু কামনা আর নেশার শেকল পড়েনি, যে গভীর ঈমানের শক্তিতে হঠাৎ এক দিন, এক ঝটকায় সেই শেকল ছিঁড়ে তারা উঠে দাঁড়াবে; বরং তাঁদের অন্তরগুলো ধীরে ধীরে বোঝাই করা হয়েছে দ্বীনের ব্যাপারে সংশয় দিয়ে। খুব সূক্ষ্মভাবে বিষিয়ে দেয়া হয়েছে ইসলাম নিয়ে চিন্তাকে। সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো হয়েছে তাদের হৃদয় থেকে ঈমানের শেকড় উপড়ে ফেলার। যেন তাদের ব্যবহার করে ইসলামকে ধ্বংস করা যায় ভেতর থেকে ।

হ্যাঁ, ইসলাম বিজয়ী হবে। যারা ঈমানদার তাঁরা সম্মানিত হবে। যারা বিরোধিতা করবে তারা অপমানিত হবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো,

> সেই দিন আপনি কোন দলে থাকবেন? আপনার সন্তানেরা কোন দলে থাকবে?
>
> আপনারা কি সম্মানিত কাফেলার অংশ হবে? নাকি দাঁড়াবেন পরাজিত ও অপমানিতদের কাতারে?
>
> আপনারা কি মুমিনদের দলে থাকবেন? নাকি মুনাফিকদের?
>
> সাবরকারীদের কাতারে থাকবেন? নাকি গাদ্দারদের?
>
> আপনার সন্তানদের নিয়ে কি মুহাম্মাদ ﷺ গর্বিত হবেন? নাকি তীব্র অনুশোচনা

নিয়ে এত কষ্ট করে পেলেপুষে বড় করা সন্তানদের সেদিন জাহান্নামের জ্বালানি হতে দেখবেন?

শুনুন, আল্লাহর দ্বীনের বিজয় নিয়ে দুশ্চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। এ দ্বীন বিজয়ী হবেই। দুশ্চিন্তা এ দ্বীনকে নিয়ে না। দুশ্চিন্তা আমাকে আর আপনাকে নিয়ে। কীভাবে আমরা এ বিজয়ের এ অংশ হব?

আল্লাহ ﷻ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿١٥﴾ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٦﴾ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ

হে মানুষ, তোমরাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী, আর আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসিত। তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদের বিলুপ্ত করতে পারেন, আর এক নতুন সৃষ্টি আনতে পারেন। আর তা আল্লাহর জন্য মোটেই কঠিন নয়। [তরজমা, সূরা ফাতির, ১৫-১৭]

আল্লাহ ﷻ সাইয়্যিদ কুতুব এর ওপর রহম করুন। তিনি বলেছিলেন,

আল্লাহর কসম! বিজয় তো মাথার ওপর ঝুলে আছে। অপেক্ষা করছে 'কুন'[৭] এর জন্য। যখন বলা হবে 'হও' তখন তা হয়ে যাবে। তাই বিজয়ের সময় দুশ্চিন্তা কোরো না। ব্যস্ত হোয়ো না; বরং নিজের অবস্থান নিয়ে চিন্তা করো। তোমার অবস্থান কি হক্কের সাথে? নাকি বাতিলের সাথে?

---

[৭] 'যখন তিনি কোনো কিছুর ইচ্ছা করেন তখন বলেন 'হও'(কুন), আর অমনি তা হয়ে যায় (ফাইয়া কুন)।' [তরজমা, সূরা ইয়াসিন, ৮২]

ইসলাম কি শান্তির ধর্ম?

'ইসলাম শান্তির ধর্ম'।

কথাটা শুনতে শুনতে আমরা বড় হয়েছি। ইসলামের সমর্থনে কথা বলার সময়ে আমরা প্রায়ই কথাটা বলি। বিশেষ করে কাফেরদের সাথে ইসলাম নিয়ে কথা বলার সময়ে পশ্চিমা বিশ্বে অবস্থান করা মুসলিমরা এ কথাটা খুব বেশি ব্যবহার করেন।

কিন্তু এ কথা বলার পর কাফেররা অনেক সময় বলে বসে, 'ইসলাম যদি শান্তির ধর্মই হয় তাহলে তোমাদের কুরআনের ওইসব আয়াতের কী হবে যেখানে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বলা হয়েছে?'

এ পর্যায়ে এসে মনে হতে শুরু করে, মুসলিমরা তাঁদের ধর্মের কিছু কিছু বিষয় লুকোতে চাচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে মুসলিমরা তর্কে জড়িয়ে যায়, পালটা জবাব ছুড়ে দেয়, 'তোমাদের কিতাবেও তো হত্যা আর যুদ্ধের কথা আছে!'

আমাদের বোঝা উচিত যে, ইসলাম নিয়ে লজ্জিত হবার কিছু নেই। আর এই উপলব্ধির জন্য আগে ইসলাম এবং ইসলামের সত্যতার নিয়ে আমাদের ভালোভাবে জানতে হবে। দৃঢ় বিশ্বাস আসার পরই কেবল আমরা এই দ্বীন নিয়ে পরিপূর্ণভাবে গর্বিত হতে পারব। এ দ্বীনের সত্যতার ঘোষণা দিতে পারব গর্বের সাথে। সারা দুনিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে স্পষ্টভাবে।

আমরা যদি বলতে চাই— ইসলাম শান্তির ধর্ম, ইসলাম ভালোবাসার ধর্ম, বা অন্য কোনো মূল্যবোধের ধর্ম—তাহলে প্রথমে দেখতে হবে, সেই মূল্যবোধটি ইসলামের সব শিক্ষার মধ্যে বিদ্যমান কি না। এমন কোনো আয়াত বা হাদিস আছে কি না, যা এর বিরুদ্ধে যায়।

তাই ইসলামের শিক্ষাকে এককথায় প্রকাশ করার জন্য 'ইসলাম শান্তির ধর্ম', বলাটা

তেমন জুতসই না। কারণ, ইসলাম সব ক্ষেত্রে শান্তির কথা বলে না। অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহ ﷻ আমাদের যুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন। এমন অনেক আয়াত এবং হাদিস আছে যেখানে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে।

কাজেই 'ইসলাম শান্তির ধর্ম' কথাটা সব ক্ষেত্রে খাটে না।

কিন্তু আমরা যদি বলি, ইসলাম হলো হক্ক ও আদলের ধর্ম, সত্য ও ন্যায় বিচারের ধর্ম, তাহলে সেটা সব অবস্থায় প্রযোজ্য হবে।

এ দুটো বৈশিষ্ট্য ইসলামের সব শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সত্য ও ন্যায়বিচারের মূল্যবোধ নিহিত আছে ইসলামের সব বিধান ও শিক্ষায়। এমন কোনো আয়াত নেই যেখানে হক্কের বিপরীত নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এমন কোনো আয়াত আপনি পাবেন না যেখানে অবিচারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ

তিনিই আল্লাহ, যিনি সত্য ও মীযান (ইনসাফের মানদণ্ড) সহকারে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। [তরজমা, সূরা আশ-শূরা, ১৭]

এবং তিনি ﷻ বলেন,

وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ

এ কুরআনকে আমি সত্যতা সহকারে নাযিল করেছি আর সত্যতা সহকারেই তা নাযিল হয়েছে। [তরজমা, সূরা আল ইসরা, ১০৫]

এবং তিনি ﷻ বলেন,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

আমি আমার রাসূলদের সুস্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠিয়েছি আর তাদের সঙ্গে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও (সত্য মিথ্যার) মানদণ্ড, যাতে মানুষ ইনসাফ ও সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। [তরজমা, সূরা আল-হাদীদ, ২৫]

তাই ইসলাম হলো হক্ক ও আদলের দ্বীন। সত্য ও ন্যায়বিচারের ধর্ম। ইসলামের সকল শিক্ষায় এ দুটো মূল্যবোধ বিদ্যমান।

অন্যদিকে শান্তির শিক্ষা সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না। এমন অনেক পরিস্থিতি আছে,

যেখানে কাফিরদের সাথে শান্তি স্থাপন করাটাই অবিচার, অন্যায়। আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হলো সত্য ও ন্যায়বিচারের দাবি।

একই কথা প্রযোজ্য, মুক্তি বা স্বাধীনতার ক্ষেত্রে। আমরা বলতে পারি না যে, 'ইসলাম স্বাধীনতার ধর্ম'।

কারণ তখন বলা হবে, 'ইসলাম যদি স্বাধীনতার ধর্মই হয় তাহলে কেন তোমরা কারো সমকামী হবার স্বাধীনতায় বিশ্বাস করো না'?

দেখুন, স্বাধীনতা মানেই ভালো, এমনটা না। এমন অনেক স্বাধীনতা আছে যা অন্যায় ও অবিচারে পূর্ণ। এমন অনেক স্বাধীনতা আছে যার স্বীকৃতি ইসলাম দেয় না।

একইভাবে এটাও ঢালাওভাবে বলা সম্ভব না যে 'ইসলাম সাম্যের ধর্ম'।

তখন বলা হবে, 'ইসলাম যদি সাম্যের ধর্ম হয় তাহলে কেন সামাজিক ভূমিকা, অধিকার এবং দায়িত্বের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার ইসলাম দেয় না?'

কিন্তু আমরা বলি, সাম্য অনেক সময় অন্যায় এবং অন্যায্য হয়ে থাকে।

শান্তি, স্বাধীনতা, সাম্য—এ সবই ইসলামে আছে। কিন্তু সেগুলো প্রযোজ্য নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে, নির্দিষ্ট মাত্রায়। ঢালাওভাবে ইসলামের সব বিধানের ভিত্তি শান্তি, স্বাধীনতা কিংবা সাম্য না।

তাহলে প্রশ্ন হলো, কীভাবে সব ক্ষেত্রে সত্য ও ন্যায়বিচারকে চেনা যাবে?

চেনার উপায় হলো সব ক্ষেত্রে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর আনুগত্য ও গোলামি করা।

ইসলাম হলো আল্লাহর প্রতি দাসত্বের ধর্ম।

ইসলাম মানুষকে মুক্ত করে কামনাবাসনার দাসত্ব থেকে। মুক্ত করে ক্ষমতাসীন, সম্পদশালী, মিডিয়া আর গণতন্ত্রের ফেরিওয়ালাদের গোলামি থেকে। ইসলাম সৃষ্টির গোলামি থেকে মানুষকে মুক্ত করে তাদের শেখায় স্রষ্টার গোলামি করতে।

এভাবে ইসলামকে বুঝলেই কেবল প্রকৃত ইসলামকে আমরা মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে পারব। মানুষের প্রশ্ন তখন আমাদের বিভ্রান্ত, বিচলিত কিংবা অপ্রস্তুত করবে না।

তাই যারা অমুসলিমদের দাওয়াহ করেন অথবা যারা ইসলামের পক্ষে কথা বলেন, তাদের প্রতি নাসীহাহ হলো, এই ব্যাপারে পরিষ্কার থাকুন। দ্ব্যর্থবোধক কথা না বলে স্পষ্ট কথা বলুন। ইসলাম শান্তির ধর্ম না বলে বলুন, ইসলাম হক্ব ও আদলের ধর্ম।

আল্লাহ ﷻ মানুষের মনে হক্ক ও আদলের প্রতি সহজাত আকর্ষণ তৈরি করে দিয়েছেন। ফিতরাতিভাবে মানুষ এ দুটোর দিকে আকৃষ্ট হয়। যারা এ দুটো মূল্যবোধ গ্রহণ করবে তাঁদের ইসলামে স্বাগতম। যারা এগুলো প্রত্যাখ্যান করবে তারা তা করবে নিজেদের বিকৃত প্রবৃত্তির কারণেই।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ

তুমি যাকে ভালোবাসো তাকে সৎপথ দেখাতে পারবে না; বরং আল্লাহই যাকে চান সৎ পথে পরিচালিত করেন... [তরজমা, সূরা আল-ক্বাসাস, ৫৬]

এটা ইসলামের সম্মান ও মর্যাদার সাথে মানানসই না যে, মানুষকে খুশি করার জন্য আমরা শান্তির স্লোগান তুলব। কিংবা সাম্য, স্বাধীনতা কিংবা অধিকারের আধুনিক সংজ্ঞার সাথে মিলিয়ে মিলিয়ে ইসলামের ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করব। আজকের দুনিয়ায় বহুল ব্যবহৃত এ শব্দগুলোর সাময়িক প্রভাব দেখে হন্তদন্ত হয়ে এর সাথে ইসলামের মিল খোঁজার কোনো প্রয়োজন নেই। এগুলো ঠুনকো কিছু বুলিমাত্র। আজকের বিশ্বে শান্তি, সাম্য, স্বাধীনতা আর অধিকারের বুলি ফেরি করে বেড়ানো লোক আর আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কথা আর কাজে কোনো মিল নেই। নিজেদের আওড়ে যাওয়া এসব আদর্শ বৈশ্বিক পলিসির ক্ষেত্রে ছুড়ে ফেলে তারা হরহামেশা।

বাস্তবতা হলো শেষ পর্যন্ত আপনি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো আদর্শ দেখবেন না, যা সত্যিকার অর্থে শান্তি, মুক্তি এবং সাম্য অর্জন করে। কারণ, ইসলাম হলো হেফাযতকৃত দ্বীন।

আহমাদ শৌকি সুন্দর বলেছেন :

রাসূল ﷺ কতো মহান যুদ্ধ করেছিলেন,

যেখানে সত্য হয়েছিল প্রতিষ্ঠিত, সমুচ্চ।

আল্লাহর সৈনিকরা কাফেরদের বিরুদ্ধে ছিলেন কঠোর,

আর তা মানবজাতির জন্য বয়ে এনেছিল কল্যাণ।

তাঁরা জাহিলিয়্যাহকে আঘাত করে নিশ্চিহ্ন করেছিলেন,

সমাপ্তি ঘটেছিল অজ্ঞতা আর ভ্রান্তির

তাঁরা শান্তি এনেছিলেন যুদ্ধ করে

আর সর্বদাই রক্ত বাঁচাতে হলে কিছু রক্ত ঝরাতে হয়

শেষ করার আগে সংক্ষেপে আবারও বিষয়টা পরিষ্কার করি।

আমরা বলছি না যে ইসলামের মাধ্যমে শান্তি স্থাপন সম্ভব না। বরং আমরা বলছি ইসলাম যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তা সাধারণ মানুষের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। অন্যদিকে অন্যায়কারী ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জারি রাখে।

ইসলাম সঠিক ধরনের শান্তির কথা বলে। যা সত্য ও ন্যায়বিচারের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এবং ইসলাম শান্তির পাশাপাশি শক্তির কথাও বলে, যা শান্তির প্রতিরক্ষা করবে।

ইসলাম ওই শান্তির কথা বলে না, যার ভিত্তি হলো বশ্যতা ও দুর্বলতা।

যারা আজ বিশ্বজুড়ে কুফর ও যুলুমের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে, শান্তির নামে পৃথিবীজুড়ে ফাসাদ করছে, তারাও কিন্তু শর্তহীনভাবে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সাম্যকে বাস্তবায়ন করে না। কখনো শান্তির কথা বলে মুসলিমদের সমালোচনা করে। আবার কখনো শান্তির বুলি বিসর্জন দিয়ে মুসলিমদের হত্যা করে গণতন্ত্রের নামে। নিজেদের খেয়ালখুশি মতো তারা এগুলোর ওপর সীমা আরোপ করে।

অন্যদিকে ইসলামও সীমা আরোপ করে। তবে আল্লাহর নাযিলকৃত শিক্ষা অনুযায়ী। হক্ক ও ন্যায়বিচারের কাঠামোর ভেতরে।

কোনো উত্তম মূল্যবোধের ওপর কাফিররা আমাদের চেয়ে বেশি হক্কদার না; বরং তারা তো শুধু মুখস্থ বুলি আওড়ায় আর স্লোগান দিয়ে বেড়ায়। আবার যেসব মূল্যবোধের নামে স্লোগান দিয়ে যায় সেগুলোকে নিজেদের খেয়ালখুশি মতো বদলে ফেলে। অনেক সময় সেগুলোর বিরুদ্ধাচরণ করে।

বিচক্ষণতার পরিচায়ক হলো সময় ঢালাওভাবে, ইসলামকে শান্তির ধর্ম না বলা; বরং বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে বলা উচিত এবং আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

আবু মুহাম্মাদ

আমার খুব কাছের, প্রিয় এক ভাই...আবু মুহাম্মাদ। চিনি বেশ অনেকদিন ধরেই। বড় মনের মানুষ। অসাধারণ আদব ও আখলাক। একবার কাছ থেকে দেখার পর ভালো না বেসে থাকা কঠিন। আবু মুহাম্মাদ জর্ডানের লোক। উনার এক ভাই আছে। দুঃখজনকভাবে তার স্বভাব আবু মুহাম্মাদের ঠিক বিপরীত।

জর্ডানেই কাজ করতেন একজন মিসরীয় ভাই। কোনো এক কারণে, কোনো একদিন সেই মিসরীয়কে অপমান করল আবু মুহাম্মাদের ভাই। দুঃখ-ভারাক্রান্ত মনে উপস্থিত মানুষের সামনে সেই মিসরীয় অভিযোগ জানাল,

'একজন মানুষের সম্বল কেবল তার আত্মসম্মান। আমরা গরিব। মিসর থেকে এখানে এসেছি পেটের দায়ে, কাজ করতে। এ দেশে আমাদের কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই। কোনো অভিভাবক নেই। নিজের বলতে আছে শুধু এই আত্মসম্মান। যদি এটাও হারিয়ে যায় তাহলে আমি আর জর্ডানে থাকতে চাই না। এর চেয়ে সম্মান নিয়ে মিসরে ফিরে যাওয়াই ভালো।'

বুকভরা ব্যথা নিয়ে টলোটলো চোখে কথাগুলো বলছিলেন মিসরের সেই ভাই। জন্মভূমির অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে বাধ্য হয়ে মানুষটা আজ ভিনদেশে। আর দশজনের মতো তিনিও চান নিজ পরিবার-পরিজনের সাথে নিজের ভিটেমাটিতে থাকতে। তিনি ফিরে যেতে চান। কিন্তু জীবিকার তাগিদে তাকে থাকতে হয়। অসুস্থ পিতামাতার ওষুধের খরচ, সন্তানদের পোশাক আর খাবারের খরচের চিন্তা তাঁকে ফিরতে দেয় না। প্রতিনিয়ত নিজের মনের সাথে যুদ্ধ করে পড়ে থাকতে হয় এ বিদেশ-বিভুঁইয়ে।

তার কথায় ক্ষোভ ছিল না, অভিযোগ ছিল না। ছিল শুধু অশ্রুভেজা দীর্ঘশ্বাস, আর প্রগাঢ় কষ্ট।

একসময় আবু মুহাম্মাদের কানে কথাগুলো পৌঁছাল। জানতে পারলেন তাঁর ভাই এক মিসরীয়কে অপমান করেছে। আবু মুহাম্মাদ মিসরীয় লোকটির কাছে গেলেন।

'আস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।'

'ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু', জবাব দিল ক্লান্ত চোখের মিসরীয়।

বাম পায়ের জুতোটা খুলে মিসরীয় মানুষটার হাতে তুলে দিলেন আবু মুহাম্মাদ। জুতো হাতে নিয়ে অবাক, অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল লোকটি।

মিসরীয় মানুষটার একদম সামনে এসে মাথা নিচু করে দাঁড়ালেন আবু মুহাম্মাদ। তারপর বললেন,

'আমি শুনেছি অমুক ব্যক্তি আপনাকে অপমান করেছে। এ জুতো দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করুন এবং আপনার হক্ক আদায় করে নিন।'

'না ভাই! আমি কেন তা করতে যাব? আর এর সাথে আপনার সম্পর্কই-বা কী?', লোকটি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল।

শান্ত, নরম গলায় আবু মুহাম্মাদ জবাব দিল, যে আপনাকে অপমান করেছে, আমি তার ভাই। আমি শুনেছি যে আপনি বলেছেন, 'আমাদের নিজের বলতে আছে শুধু এই আত্মসম্মান। যদি এটাও হারিয়ে যায়, তাহলে আমি আর জর্ডানে থাকতে চাই না।' ভাই আপনি জর্ডানে মাথা উঁচু করে থাকবেন। আপনার সম্মান অটুট থাকবে। আমরা এখানে সবাই আপনার ভাই, কেউ আপনাকে আর অপমান করার স্পর্ধা দেখাবে না।

মিসরীয় মানুষটার কাঁপাকাঁপা হাত থেকে পড়ে গেল জুতোটা। এক ঝটকায় আবু মুহাম্মাদকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। চুমু খেলেন তাঁর মাথায়। ঈমান ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের এ দৃষ্টান্ত দেখে তাঁর চেহারা আর মন থেকে দূর হয়ে গেল দুঃখের সব ছাপ। আবু মুহাম্মাদের আচরণে তিনি কুরআনের এ আয়াতের বাস্তবায়ন দেখলেন,

...إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। [তরজমা, সূরা হুজুরাত, ১০]

আল্লাহ ﷻ আবু মুহাম্মাদকে হেফাযত করুন, তাঁকে হিদায়াতের ওপর অটল রাখুন।

আমি ইচ্ছে করেই আবু মুহাম্মাদের পুরো নাম বললাম না। আমি জানি জর্ডানে তাঁর অনেক অনুসারী আছেন এবং পুরো নাম বললে সবাই তাঁকে চিনে ফেলবেন।

আমার প্রিয় ভাইয়েরা, আমরা যদি আমাদের প্রবাসী কিংবা উদ্বাস্তু মুসলিম ভাইদের সাথে ভালো ব্যবহার করি, তাদের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা পোষণ করি, তাদের কষ্টের সময় তাদের পাশে দাঁড়াই, তবে সেটা তাদের প্রতি আমাদের মহানুভবতা না; বরং এগুলো আমাদের দায়িত্ব এবং এ কাজগুলো ইবাদাত। এই ইবাদতের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করি। আল্লাহর কসম! আমরা সবাই ভাই। মানুষের বানানো সীমান্তের কোনো মূল্য আমাদের কাছে নেই। জাতীয়তাবাদী সীমান্ত আমাদের ভালোবাসার মাপকাঠি না।

শত্রু যখন উম্মাহর দেহে ছুরি চালায়, তখন আমাদের দায়িত্ব হলো সদাচরণ এবং উত্তম আখলাকের দ্বারা সেই ক্ষতের পরিচর্যা করা। শত্রুর ফাঁদে পা দিয়ে মানুষের বানানো সীমান্ত আর ঘৃণ্য জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে দলে দলে বিভক্ত হওয়া আমাদের কাজ না। আমরা মুসলিম, এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয়। আর যে অপরাধী তার বিচার হবে তার অপরাধ অনুযায়ী। তার জন্ম, গোত্র কিংবা জাতীয়তা অনুযায়ী না।

আমরা আল্লাহ ﷻ-এর কাছে দু'আ করি, তিনি যেন উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করে দেন, আমাদের অবস্থা সংশোধনের সুযোগ দেন।

ভালোবাসা গোপন করা যায় না

ভালোবাসা গোপন করা যায় না। এটাই বাস্তবতা।

প্রেমে পড়া মানুষ কোনো-না-কোনোভাবে তার ভালোবাসার কথা প্রকাশ করে ফেলে। ভাই-বোন, বন্ধু, মা— কারও-না-কারও কাছে মন উজাড় করে কথা বলতে হয়। কথা বলার সময় সে অপ্রাসঙ্গিক নানা বিষয় টেনে আনে, কোনো-না-কোনো ছুতোয় যাতে নিজের মনের অনুভূতিগুলো জানানো যায়। নিজের ভালোবাসার কথা প্রকাশ করা যায়।

সে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করে কখন বন্ধু প্রশ্ন করবে আর সে তার ভালোবাসা নিয়ে কথা বলার সুযোগ পাবে। প্রেমিক তার ভালোবাসা প্রকাশ করে আনন্দ পায়। মনে করে ভালোবাসার কথা বলতে পারলে বুঝি দিশেহারা অবস্থা কিছুটা কমবে। কিন্তু প্রেমের আগুন এতে কমে না; বরং বেড়েই চলে।

এ বাঁধভাঙা আবেগের কারণেই মানুষ কবিতা লেখে। যারা জীবনে কবিতা লেখেনি, এমনকি পড়েওনি তারাও নাম লেখায় ব্যর্থ কবির লম্বা লিস্টে।

অনেকে বলেন ভালোবাসা থেকে বিশুদ্ধ বিয়ের জন্ম হয়, অনেকে বলেন ভালোবাসার বিয়েতে পা পিছলে যায়। অনেকে বলেন, ভালোবাসার আগুন উপেক্ষা করতে হয়, নিভিয়ে দিতে হয়। আবার অনেকে বলেন, ভালোবাসার শক্তিতে বিশ্বজয় করা যায়। এগুলোর কোনো কিছুই আমার আলোচনার বিষয় না। ভালোবাসা কি হালাল নাকি হারাম, সেটাও নিয়েই আমরা এখানে কথা বলছি না। সেটা আলাদা আলোচনা; অল্প পরিসরে যার হক্ব আদায় করা যাবে না।

আমি শুধু একটা সত্যের দিকে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাচ্ছি। সত্যটা হলো,

ভালোবাসা গোপন করা যায় না।

মানুষের জন্য মানুষের যে ভালোবাসা সেটাই বাঁধভাঙা। উপচেপড়া। হিসেব ছাড়া!

তাহলে চিন্তা করুন, আল্লাহ ﷻ এর জন্যে বান্দার যে পবিত্র, বিশুদ্ধ, ভালোবাসা সেটা কেমন হবে?

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ

কিন্তু যারা মু'মিন আল্লাহর সঙ্গে তাদের ভালোবাসা প্রগাঢ় [তরজমা, সূরা বাক্বারা, ১৬৫]

এটা কি আদৌ সম্ভব যে আপনি আল্লাহকে ভালোবাসবেন আর সেটা প্রকাশ পাবে না? ভালোবাসা কি কোনো-না-কোনোভাবে প্রকাশ হয়েই যায় না? তাহলে এই তীব্র ভালোবাসার প্রকাশ কীভাবে না হয়? নিরন্তর এ ভালোবাসার প্রকাশ কি আপনাকে আনন্দ ও সন্তুষ্টি এনে দেবে না?

আমরা যখন মুসলিমদের স্বতন্ত্র লেবাস বা পোশাকের গুরুত্বের কথা বলি, তখন অনেকে নারাজ হন। অনেকে কাছে একে খুব বড় একটা বোঝা মনে হয়। অনেকে তো মনে করেন এ হলো 'ধার্মিক' হবার 'ট্যাক্স'। কিন্তু যে আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে ভালোবাসে, তার কাছে এটা কখনো বোঝা মনে হয় না; বরং সে এতে আনন্দ পায়। পোশাকের মাধ্যমেও সে নিজের মুসলিম পরিচয়ের ঘোষণা দেয়। আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে।

আজ যে বাইরে থেকে দেখেও আল্লাহর ইবাদতকারী আর শয়তানের ইবাদতকারীর মধ্যে পার্থক্য করা যায় না। এটা কেমন কথা বলুন তো? আমি কিন্তু এখানে রূপক অর্থে শয়তানের উপাসনাকারী বলছি না। আমি সত্যিকারের শয়তান উপাসক বা স্যাইটানিস্টদের কথা বলছি। যারা আক্ষরিকভাবে শয়তানের উপাসনা করে, আজ তাদের পাশাপাশি মুসলিমদের দাঁড় করালে অনেক ক্ষেত্রেই আপনি ধরতে পারবেন না কে আর-রাহমানের ইবাদাত করে আর কে আর-রাজীমের। সেই একই লেইটেস্ট ফ্যাশনের পোশাক, ট্রেন্ডি হেয়ারকাট, একইধরনের আচরণ। কারও সাথে বসে, সময় নিয়ে আলাদা করে কথা না বললে, আপনি বুঝতেই পারবেন না কার আকিদাহ কোনটা।

হে মুসলিম, তাওহিদ ও রিসালাতে বিশ্বাস করে না এমন লোকের চেহারা, বেশভূষার সাথে তোমার কোন পার্থক্য পাওয়া যায় না, এটা কেমন কথা?

হে মুসলিমাহ, কুরআন ও নবী ﷺ-কে বিশ্বাস করে না এমন একটা মেয়ের সাথে তোমার কোনো পার্থক্য পাওয়া যায় না, এটা কেমন কথা?

নিজের পোশাক, নিজের বাহ্যিকতার মধ্যে ইসলামকে ধরে রাখাকে কঠিন কোনো দায়িত্ব হিসেবে দেখার দরকার নেই; বরং এ হলো আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর প্রতি আন্তরিক ভালোবাসার প্রকাশ।

আর জানেনই তো, ভালোবাসা গোপন করা যায় না।

গৌরবের উত্তরসূরী

রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে বের হয়েছেন। বসে আছেন তাঁর ﷺ উটের পিঠে।

দিনরাত টানা-খাটুনি, ইবাদাত, সাহাবী -দের শেখানো আর জিহাদ...নিরন্তর কাজের চাপে ক্লান্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। উটের পিঠে বসা অবস্থায় হেলে পড়লেন একপাশে।

ব্যাপারটা চোখে পড়ল সাহাবী আবু ক্বাতাদা আল-আনসারী -এর। দ্রুত এগিয়ে এসে, আলতোভাবে ধরলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে। তবে লক্ষ রাখলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘুম যেন না ভাঙে।

এভাবে একবার, দু-বার, তিনবার। প্রতিবার আবু ক্বাতাদা এগিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ধরলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ জাগলেন। অন্ধকারে প্রশ্ন করলেন, কে?

আবু ক্বাতাদা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কতক্ষণ ধরে তুমি এভাবে আমার সাথে চলছ?

অর্থাৎ তিনি বোঝালেন, কতক্ষণ ধরে তুমি আমাকে এভাবে ধরে রেখেছ, যেন আমি উট থেকে পড়ে না যাই?

আবু কাত্বাদা বললেন, আমি এভাবে আপনার সাথে আছি মধ্যরাত থেকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ তোমাকে হেফাযত করুন, যেভাবে তুমি তাঁর রাসূলের হেফাযত করেছ (পড়ে যাওয়া থেকে)।

হাদিসটি আছে সহিহ মুসলিমে।[৮]

কত সুন্দর একটি দু'আ। এ দু'আ শুধু আবু ক্বাতাদা ﷺ-এর জন্যে না; বরং যারাই যুগে যুগে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিরক্ষায় এগিয়ে এসেছে, তাঁরা এই দু'আর ভাগীদার হবে ইন শা আল্লাহ।

'আল্লাহ তোমাকে হেফাযত করুন, যেভাবে তুমি তাঁর রাসূলের হেফাযত করেছ।'

আজ ইসলামের শত্রুরা তাদের বহুমুখী আক্রমণের নিশানা বানিয়েছে নবী ﷺ-এর সুন্নাহকে। আজ অসংখ্য মিডিয়া। নতুন নতুন চ্যানেল। নিত্যনতুন গজিয়ে ওঠা প্ল্যাটফর্ম। আজ জনপ্রিয় হওয়া খুব সোজা। একের পর এক তোতাপাখিরা আমাদের সামনে যায় আসে। অযোগ্য, মূর্খ লোকেরা সাধারণ মানুষের সামনে হাজির হয় সব বিষয়ে মতামত নিয়ে। টিভি চ্যানেল থেকে শুরু করে সব প্ল্যাটফর্মে এদেরই দেখা যায়।

এদের অধিকাংশের উদ্দেশ্য থাকে সুন্নাহর বিরুদ্ধে লড়াই করা। নবী ﷺ-এর সুন্নাহকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা। পশ্চাৎপদ হিসেবে তুলে ধরা। আবার অনেক সময় সরাসরি নবী ﷺ-কেই আক্রমণ করে । এসব কিছুর পেছনে মূল উদ্দেশ্য হলো মুসলিমদের তাঁদের শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন করা, যাতে গ্লোবালাইযেইশান আর আধুনিকতার দমকা বাতাসে খড়কুটোর মতো উড়ে যাই আমরা।

এদের মোকাবিলা কারা করবে? কারা করছে?

হে ইলম অন্বেষণকারী, যে নবী ﷺ-এর সুন্নাহর সমর্থনের জন্যে নিজের সময় ও শ্রম ব্যয় করছেন ইলম অর্জনে। সুসংবাদ গ্রহণ করুন, যদি আপনার নিয়্যাত সহিহ হয়, তাহলে ইন শা আল্লাহ আপনি এ দু'আর অন্তর্ভুক্ত।

'আল্লাহ আপনাকে হেফাযত করুন, যেভাবে আপনি তাঁর রাসূলের হেফাযত করেছেন।'

সব বাধা, প্রতিকূলতা, তাচ্ছিল্য, বিদ্রুপ এবং যুলুমের বিরুদ্ধে এই একটি দু'আ আমাদের জন্য যথেষ্ট।

হতাশ হবেন না, দুঃখ পাবেন না, কারণ আপনি আল্লাহর হেফাযতে আছেন।

---

[৮] সহিহ মুসলিম, ৬৮১

ময়লাফেলা ইহুদীর গল্প

গল্পটা আমরা সবাই শুনেছি। এক ইহুদী প্রতিদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরজার সামনে ময়লা ফেলত। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিদিন সেই ময়লা সরিয়ে দিতেন। তারপর নিজের কাজে যেতেন। একদিন তিনি ﷺ দেখলেন দরজার সামনে কোনো ময়লা পড়ে নেই। মানুষজনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন সেই ইহুদী অসুস্থ। তিনি ﷺ তখন তাকে দেখতে গেলেন। তাঁর ﷺ এ আচরণে মুগ্ধ হয়ে ইহুদী ইসলাম গ্রহণ করল।

এ পুরো গল্পটা বানোয়াট। লক্ষ করুন, আমি একে 'দুর্বল' হাদিস বলছি না। এটা হলো জাল হাদিস। অর্থাৎ এটা কোনো হাদিসই না। এমন কোনো ঘটনা ঘটেইনি।

ময়লা-ফেলা ইহুদী সংক্রান্ত এ গল্পের কোনো সনদ তো নেই-ই, অর্থের দিক থেকেও এটা ভুল।

কারণ,

> ১। মদীনাতে যাবার আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহুদীদের সংস্পর্শে আসেননি। মক্কাতে কোনো ইহুদী ছিল না। আর মদীনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মুসলিমদের নেতা। শুধু তা-ই না, তিনি ছিলেন মদীনাহর শাসক। ইহুদীরা সেখানেও তাঁর ﷺ বিরুদ্ধে চক্রান্ত করত, কিন্তু সেটা গোপনে, অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায়। কাজেই মদীনাহতে তাঁর ﷺ ঘরের দরজায়, মাসজিদুন নববীতে গিয়ে কোনো ইহুদী ময়লা ফেলে আসার স্পর্ধা করাই সম্ভব ছিল না।
>
> ২। এটা কীভাবে সম্ভব যে কোনো ইহুদী কাফের রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরজার সামনে প্রতিদিন ময়লা ফেলে যাবে, আর সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم সেটা দেখে চুপচাপ বসে থাকবেন? আর কিছু না হলেও তো কম-সে-কম তারা দরজার সামনে থেকে ময়লাটা নিজেরা সরিয়ে দেবেন। সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم বেঁচে থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘর থেকে বের হওয়া পর্যন্ত ময়লা তাঁর দরজার সামনেই পড়ে থাকবে, এটা কি

আদৌ সম্ভব?

৩। এই গল্পটা দিয়ে অনেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিষ্ণুতার উদাহরণ দিতে চান। কিন্তু এটা তো সহিষ্ণুতা না; বরং এ হলো দুর্বলতা এবং আল্লাহর রাসূল ﷺ এ থেকে মুক্ত।

যখন কেউ ভুল করে বা কালেভদ্রে অনুচিত কোনো কাজ করে ফেলে তখন সেটা মাফ করে দেয়া হলো সহিষ্ণুতা। কিন্তু এক ইহুদী কাফের দিনের পর দিন এই কাজ করে যাচ্ছে আর রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো কিছু না বলে শুধু ময়লা সরিয়ে যাচ্ছেন, এটা দুর্বলতা এবং আমরা বিশ্বাস করি রাসূলুল্লাহ সাল্লাম ﷺ এমন কিছু থেকে মুক্ত। তিনি এর উর্ধ্বে।

এ গল্প নির্জলা মিথ্যাচার।

শাইখ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ বলেন,

আজকাল লোকেদের মধ্যে একটা কাহিনি প্রচলিত আছে-

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর একজন ইহুদী প্রতিবেশী ছিল। সে তাঁর ﷺ ক্ষতি করার চেষ্টা করত এবং তাঁর ﷺ ঘরের সামনে ময়লা ফেলত। তাঁর ﷺ রাস্তায় কাঁটা বিছিয়ে রাখত।

আসলে হাদিসের কোনো কিতাবে এমন কোনো বর্ণনার অস্তিত্ব নেই। কোনো আলিম এমন কোনো ঘটনা উল্লেখ করেননি; বরং এটা কেবল আধুনিক সময়ের কিছু বক্তা, দা'ঈ আর সুফীদের কথায় শুনত পাওয়া যায়। কিন্তু তারাও কোনো সূত্র উল্লেখ করে না।

আর একজন মুসলিমের দায়িত্ব হলো আলিমগণ যে বর্ণনাগুলো গ্রহণ করেছেন সেগুলো গ্রহণ করা। বিশেষত ইহুদীকে নিয়ে এই বর্ণনা যেহেতু ত্রুটিপূর্ণ।"[১]

আমার ভাই ও বোনেরা, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সীরাত নিয়ে আল্লাহকে ভয় করুন। জাল, বানোয়াট এবং দুর্বল বর্ণনাগুলো সনাক্ত করার উপায় আজ অনেক। খুব সহজে যে কেউ তাহকীক করা হাদিস সংকলন কিনে নিতে পারে। কিংবা একজন আলিমের কাছে গিয়ে জেনে নিতে পারে। তাই এ ক্ষেত্রে গাফেলতির কোনো অজুহাত আমাদের নেই।

---

[১] ইসলামকিউএ সাইট থেকে – https://bit.ly/38Lj7Gg

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাবর, রাহমাহ এবং আত্মত্যাগ নিয়ে অনেক সহিহ বর্ণনা আছে। সহিহ হাদিসের সংকলনগুলোতে সহজেই সেগুলো পাবেন। এগুলো রেখে কেন আমাদের জাল, বানোয়াট কিচ্ছা-কাহিনি থেকে শিক্ষা নিতে হবে?

এক গালে চড় খেলে আরেক গাল পেতে দাও, এ ধরনের আদর্শ নিজ সন্তানদের শেখাবেন না। আমরা নবী ﷺ-গণের ওপর এ ধরনের আদর্শ আরোপ করি না। আমরা বিশ্বাস করি যে তাঁদের ﷺ মাকাম, সম্মান ও মর্যাদা এ ধরনের অবস্থানের চেয়ে অনেক উঁচু।

আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা, যে সঠিকভাবে ইসলামের ব্যাপারে জানতে চায়, দ্বীনের দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে চায়, তার জন্য আবশ্যিক হলো এধরণের বানোয়াট কথাবার্তা মাথা থেকে মুছে ফেলা। কারণ, দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, এ গল্পের মতোই এমন অনেক জাল, ভিত্তিহীন কথাবার্তা ছোটবেলা থেকে আমাদের সত্য হিসেবে শেখানো হয়েছে। আমরাও সেগুলো প্রশ্নাতীত সত্য হিসেবে ধরে নিয়েছি। এ ধরনের যত ভুল ধারণা ও তথ্য মাথায় মজুদ হয়েছে, তার সবকিছু মুছে ফেলতে হবে। সবকিছু ফরম্যাট দিতে হবে।

প্রিয় পাঠক, আমি আপনাদের অনুরোধ করব আমাদের প্রিয় নবীজী ﷺ-এর সহিহ সুন্নাহ জানার এবং সে অনুযায়ী আমল করার। এবং অন্যদের এর জন্য উদ্বুদ্ধ করার।

পর্দা করার 'স্বাধীনতা'?

পর্দা বা হিজাবের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে অনেক সময় আমরা বলে বসি, 'হিজাব হলো ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিচায়ক।'

কথাটা ভুল। হিজাব ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিচায়ক না। আসলে দাওয়াহ করতে গিয়ে কিংবা ইসলামের পক্ষ নিতে গিয়ে আমরা এমন অনেক কথা বলে ফেলি যেগুলো ইসলামের মৌলিক আকিদাহ এবং সঠিক বুঝের সাথে সাংঘর্ষিক। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো এ নিয়ে আমাদের তেমন মাথাব্যথা নেই। যেকোনো মূল্যে কাফিরদের সাথে তর্কে জেতার, কিংবা তাদের কাছে ইসলামকে 'গ্রহণযোগ্য' করে তুলে ধরার দায়িত্ব যেন আল্লাহ ﷻ আমাদের দিয়েছেন। আর আমরা ইসলামকে বিকৃত করে সেই দায়িত্ব পালন করছি!

ইসলাম নিয়ে কথা বলার আগে কোন কথাটা, কোন প্রেক্ষাপটে কীভাবে বলতে হবে, সেটা বোঝা দরকার। বিশেষ করে কাফির কিংবা ইসলামবিদ্বেষীদের সাথে তর্কে যাবার আগে এ বুঝটা থাকা আরও বেশি জরুরি।

ধরুন, একজন কাফিরের সাথে কথা হচ্ছে। সে দ্বীন ইসলামকে একমাত্র সত্য ধর্ম মনে করে না। সে বিশ্বাস করে না যে কুরআন হলো আল-ফুরকান বা সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। এমন একজন কাফিরকে আপনি বলতে পারেন,

> 'তোমরা দাবি করো স্বাধীনতা তোমাদের সবচেয়ে বড় মূল্যবোধ। তোমাদের এ মূলনীতির সাথে আমি একমত না, তবে তোমাকে মানতেই হবে যে এ মূলনীতি অনুযায়ী হিজাব করাও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তোমরা অন্য সব কিছু মেনে নিলেও, হিজাব-নিকাবের বেলায় এসে বাধা দাও। কেন? তোমরা তো নিজেদের নীতি নিজেরাই মানো না। যখন দরকার হয় তখন মিথ্যা বলো আর কথা বদলে ফেলো।'

এখানে আপনি তার কথা দিয়েই তাকে আটকাচ্ছেন। ইসলামের ব্যাপারে তাদের দ্বিমুখী আচরণের বাস্তবতা তুলে ধরছেন। আবার এটাও পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছেন যে 'আমি তোমাদের নীতিটা মেনে নিচ্ছি না। কিন্তু তোমাদের কথা অনুযায়ীই হিজাবের ব্যাপারে তোমাদের অবস্থান ভুল।'

এভাবে একজন কাফিরের সাথে কথা বলা যেতে পারে। কিন্তু একজন মুসলিমদের সামনে এভাবে কথা বলার কী অর্থ? একজন মুসলিম তো মেনেই নিয়েছে যে আল্লাহ ﷻ হলেন একমাত্র বিধানদাতা। সে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছে।

আল্লাহ ﷻ হিজাব করার আদেশ দিয়েছেন, ব্যস, এটুকুই তো যথেষ্ট। একজন মু'মিনের জন্য এর চেয়ে বড় তো আর কোনো কারণ হতে পারে না।

তাহলে মুসলিমদের সামনে কেন হিজাবকে 'অধিকার' কিংবা 'ব্যক্তি-স্বাধীনতা' হিসেবে তুলে ধরতে হবে? কেন সোশ্যাল মিডিয়াতে 'হিজাব করার অধিকার' কিংবা 'হিজাব আমার স্বাধীনতা', এর মতো স্লোগান তোলা হবে?

এ ধরণের স্লোগানে দুটো বড় সমস্যা আছে।

১। এর অর্থ হলো আমরা 'ব্যক্তি-স্বাধীনতা' এর মূল্যবোধকে মেনে নিয়েছি। যেন এ হলো কোনো অলঙ্ঘনীয়, পবিত্র বিধান। অথচ মুসলিমের জন্য সবচেয়ে বড় মূল্যবোধ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হলো এক আল্লাহর আনুগত্য করা। আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে সত্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

আল্লাহর আনুগত্যের সাথে সাংঘর্ষিক প্রতিটি কাজ হলো গুনাহ। মুসলিমদের দায়িত্ব সমাজ থেকে এসব গুনাহকে উপড়ে ফেলা। এগুলো 'যার যার ইচ্ছে' বলে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। সাফাই গাওয়া যাবে না ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে। স্বাধীনতা মানেই সত্য না, স্বাধীনতা মানেই ইনসাফ না। গুনাহ করারও স্বাধীনতা হয়। কুফরেরও স্বাধীনতা হয়।

২। এসব স্লোগানের অর্থ হলো আমরা ব্যক্তি-স্বাধীনতার আলোকে নারীদের হিজাব করতে দেয়ার কথা বলছি। এটা পুরোপুরি বাতিল কথা। পর্দা করার আদেশ এসেছে মানবজাতির প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। এটি আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে ফরয বিধান। এটা কোনো 'ব্যক্তি-স্বাধীনতা' না।

মুমিন তো মুনাফিকদের মতো সুযোগসন্ধানী হয় না। নিজেদের প্রয়োজনমতো মুনাফিকরা অনেক কিছু গ্রহণ করে, আবার প্রয়োজন ফুরোলে ছুড়ে ফেলে দেয়। কিন্তু আমরা তো মুমিন, মুনাফিক না।

আজ আমরা ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্লোগান তুলে হিজাবের কথা বলবো। কাল যখন এই একই ব্যক্তি-স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে কেউ নিজেকে উন্মুক্ত করার কিংবা প্রকাশ্য অশ্লীলতার স্বাধীনতার কথা বলবে? তখন কী হবে? জনসম্মুখে ঘটতে থাকা গুনাহ দেখেও আমাদের তখন চুপ থাকতে হবে। আমরা মুখ খুলতে পারব না। কারণ, তাহলে আমাদের কথা আর কাজ সাংঘর্ষিক হয়ে যাবে। যদি হিজাব করা ব্যক্তি-স্বাধীনতা হয় তাহলে হিজাব খোলা, কিংবা নিজের পছন্দমতো যেকোনো কিংবা সবটুকু পোশাক খোলাও ব্যক্তি-স্বাধীনতা। ওদের যুক্তি তো ঠিকই আছে!

আর এগুলো কিন্তু কোনো কল্পিত উদাহরণ না। আমাদের চারপাশেই এমন অনেক কিছু ঘটছে।

ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্লোগান দিয়ে নিজের অজান্তেই সেক্যুলারিযম বাস্তবায়নের পথ খুলে দিচ্ছি আমরা। যারা ইসলামের 'সংস্কার' করতে চায়, রসদ তুলে দিচ্ছি তাদের হাতে।

'হিজাব করার অধিকার' কথাটাও একই রকমের ভুল। কথাটা শুনে মনে হয়, হিজাব করা নারীর ঐচ্ছিক ব্যাপার। সে চাইলে পর্দা করল, না চাইলে করল না।

এ সবকিছু আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক। অথচ এই মূলনীতিই হলো মুসলিম উম্মাহর এবং মুসলিম পরিচয়ের কেন্দ্রবিন্দু।

কেউ হয়তো বলতে পারেন,

'তাহলে কি তোমার হাতে ক্ষমতা থাকলে তুমি সবার ওপর হিজাব 'চাপিয়ে' দিতে?'

এই পার্শ্ববর্তী আলোচনায় আমি এখন যাব না। আমার ক্ষমতা থাকলে আমি কী করতাম সেটা এখানকার আলোচনার বিষয় না। আমি শুধু মুসলিমদের এটুকুই মনে করিয়ে দিতে চাচ্ছি যে, ইসলামের বিধানের প্রতি আত্মসমর্পণ করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর বাধ্যতামূলক। বিধান কেবলই আল্লাহর। শাসনকর্তৃত্ব শুধুই তাঁর। যদিও মুসলিমদের ভূখণ্ডগুলো আজ মানবরচিত কুফরের আইন দিয়ে শাসিত হচ্ছে, তবুও একথাগুলো প্রত্যেক মুসলিমকে বিশ্বাস করতে হবে।

কোনো বেপর্দা নারীও যদি বলে,

> 'মুসলিমের অবশ্যই আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে এবং তাদের আদেশ অনুযায়ী কাজ করতে হবে। আমি জানি পর্দা না করে আমি আল্লাহর অবাধ্য হচ্ছি। কিন্তু আমার যে বোনরা পর্দা করেন আমি তাদের পুরোপুরি সমর্থন করি। আমি গুনাহগার হতে পারি, কিন্তু আমি আমার দ্বীনকে সমর্থন করি, আমি আমার রবের বিধানকে

ভালোবাসি...'

তাহলে আমরা তার এ কথা প্রশংসা করা। তার জন্য দু'আ করব যেন তিনি পরিপূর্ণভাবে ইসলামের ওপর চলতে পারেন।

অন্যদিকে বোরকা পরা, নিকাব করা কোনো নারীও যদি বলে,

> 'হিজাব করা হলো ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রশ্ন। যারা পর্দা করতে চান তাদের পর্দা করতে দেয়া উচিত...'

তাহলে আমরা তাকে বলব,

তুমি মুসলিম নারীদের পক্ষে কথা বলছ, কিন্তু জাহিলিয়্যাহর স্লোগান তুলে। তোমার এ কথাকে অতটুকুই প্রশংসা করা যায়, যতটুকু প্রশংসা করা যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমর্থনে মুশরিক মুত'ঈম বিন 'আদির ভূমিকার। আবু তালিবের মৃত্যুর পর মক্কার কুরাইশরা যখন মুসলিমদের অবরুদ্ধ করে রেখেছিল ও বয়কট করেছিল, মুত'ইম তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ নিয়েছিল। কিন্তু এর কারণ ছিল ব্যক্তিগত উদারতা। ঈমান না। কাজেই সাবধান হোন। নিজের হাতে নিজের ঈমানের ভিত্তি গুঁড়িয়ে দেবেন না।

হিজাব ব্যক্তি-স্বাধীনতা না। ঐচ্ছিক কিছু না। হিজাব আল্লাহর হুকুম। ফরজ বিধান।

মহান আল্লাহ ﷻ বলেন,

> إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

যখনই মুমিন বান্দাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সম্পর্কে কোনো কথা বলা হয়, তখন তারা বলে ওঠে, "আমরা শুনলাম ও মানলাম।" "আর তারাই প্রকৃত সফলকাম।" আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মান্য করে চলে, আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে সচেতন থাকে, আর তারাই সফলকাম।
[তরজমা, সূরা আন-নূর, ৫১-৫২]

বাজারের স্বাধীনতা

কিছুদিন আগে একটা ভিডিও বেশ ভাইরাল হয়েছিল। পশ্চিমা কোনো দেশের রাস্তার দৃশ্য। ঘুরেঘুরে পথচারী মহিলাদের কাছে প্রস্তাব নিয়ে যাচ্ছে এক লোক। ক্যামেরার সামনে খোলা রাস্তায় মাথা কামাতে হবে। বিনিময়ে তাদের কিছু টাকা দেয়া হবে।

একজন মহিলা রাজি হলো। রাস্তার সবার সামনে সেই লোকটি তার মাথা কামিয়ে দিল। আশেপাশে জড়ো হওয়া মানুষ পুরোটা সময়জুড়ে খুব আমোদের সাথে তালি আর শিস দিয়ে গেল। এদের মধ্যে ছিল অনেক নামধারী পুরুষও।

তামাশা শেষ হবার পর, ভিখারির মতো রাস্তা থেকে চুলগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে ব্যাগে ভরল নারীটি।

কী অদ্ভুত, বিচিত্র এক দৃশ্য।

> 'আচ্ছা, এখানে খারাপ কী হয়েছ? মহিলা স্বেচ্ছায় রাজি হয়েছে। টাকাও পেয়েছে। এখানে সমস্যা কী? আপনার কাছে ব্যাপারটা ভালো না লাগতে পারে, তার অধিকার আছে নিজের মতো করে সিদ্ধান্ত নেয়ার।'

তাই না?

এই হলো নারী স্বাধীনতা আর নারী অধিকারের বাস্তবতা।

এই সেই অধিকার আর স্বাধীনতা, যা মুসলিম-বিশ্বে আমদানি করার জন্য প্রবল উৎসাহে কাজ করে যাচ্ছে পশ্চিমা বুলি শেখা তোতা পাখিরা ।

এ হলো এমন এক স্বাধীনতা, যা নারীকে সস্তা, তুচ্ছ পণ্যে পরিণত করে। এমন এক স্বাধীনতা, যার কারণে টাকার জন্য মানুষের সামনে সম্মান বিলিয়ে দিতেও বাধে না।

আল্লাহ যেন এমন স্বাধীনতা আর অধিকারের ওপর লানত করেন।

এ ভিডিওটা যখন ভাইরাল, ঠিক সেই সময়টাতেই এখানকার এক টিভি চ্যানেলে জরিপ চলছিল :

'আপনি কি নিকাব নিষিদ্ধ করা সমর্থন করেন?

নাকি আপনি মনে করেন নিকাব করা ব্যক্তি-স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত?'

আসলে তাদের সমস্যা শুধু নিকাব নিয়ে না। তারা একে একে সবকিছুই সরাতে চায়। প্রথমে নিকাব, তারপর হিজাব, তারপর 'সামাজিক শালীনতা', ইত্যাদি। যেন একসময় আমাদের নারীদের অবস্থাও রাস্তা থেকে নিজের চুল কুড়িয়ে নেয়া সেই নারীর মতো হয়। মুসলিমাদের ওই একই অবস্থায় নামিয়ে আনা পর্যন্ত ওরা থামবে না।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾
يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا

আর আল্লাহ চান তোমাদের তাওবা কবুল করতে। আর যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায় যে, তোমরা প্রবলভাবে (সত্য পথ থেকে) বিচ্যুত হও। আল্লাহ তোমাদের থেকে (বিধান) সহজ করতে চান আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বল করে। [তরজমা, সূরা নিসা, ২৭-২৮]

'নিকাব তো ফরয না!'

শত্রুর ফাঁদে পা দিয়ে নিজেদের মধ্যে তর্কবিতর্কে জড়ানো নির্বুদ্ধিতার লক্ষণ। এসব তর্কে জড়িয়ে নষ্ট করার মতো সময় এখন আমাদের নেই। এই অর্থহীন তর্কের সুযোগে আমাদের দ্বীনের ওপর নতুন কোনো আক্রমণের নীল নকশা বোনে শত্রুপক্ষ।

পৃথিবীর বেশ কিছু দেশে আজ নিকাব নিষিদ্ধ করার ষড়যন্ত্র চলছে। এমন পরিস্থিতিতে নিকাব ওয়াজিব নাকি মুস্তাহাব সেটা নিয়ে তর্ক শুরু করার কোনো মানে হয় না। কে, কখন, কোথায় নিকাব পরে কোন অপরাধ করেছে সেসব গল্প একসুতোয় গাঁথার সময়ও এটা না।

নিকাবের ব্যাপারে শরীয়াহর অবস্থান কী, সেটা নিয়ে আমাদের শত্রুদের কোনো মাথাব্যথা নেই। কোনো সুস্থ মানুষ কি মনে করে যে ফিকহী তর্কের জায়গা থেকে ওরা নিকাব নিষিদ্ধ করেছে? ওদের এজেন্ডা ভিন্ন। ওরা কী চায় সেটা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন,

وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا

আর যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তারা চায় যেন তোমরা প্রবলভাবে (সত্য পথ থেকে) বিচ্যুত থাকো। (আন-নিসা, ৪: ২৭)

আর ওদের চূড়ান্ত লক্ষ্য কী, সেটাও আল্লাহ ﷻ আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

তারা তোমাদের সাথে লড়াই করতে থাকবে, যতক্ষণ না তোমাদেরকে তোমাদের দীন থেকে ফিরিয়ে দেয়, তারা যদি পারে... [তরজমা, সূরা আল-বাক্বারা, ২১৭]

আর আমাদের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ কিন্তু নিকাব, দাড়ি বা ইসলামের কিছু বিধান

নিয়ে না। তাদের অভিযোগ হলো :

إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ

তারা এমন লোক, যারা অতি পবিত্র হতে চায়। [তরজমা, সূরা আল-আরাফ, ৮২]

ওদের প্রতিটি পদক্ষেপের পেছনে এই হলো মূল এজেন্ডা।

মনে করুন, আপনি ধীরস্থিরভাবে ওযু করে দুই রাকা'আত সালাত আদায় করার নিয়্যাত করলেন। এমন সময় হাজির হলো নাপাকিতে মাখামাখি দুর্গন্ধময় পোশাক পরা এক মাতাল। বোঝাই যাচ্ছে কমপক্ষে কয়েক সপ্তাহ গোসল না করে আছে। তারপর এই মাতাল আপনার কাপড় টেনে ধরে বলল,

'এই খবরদার বলছি! ওযু করবি না! সালাত আদায় করবি না! ভালো হবে না কিন্তু বলে দিচ্ছি...'

এমন সময় আরেক লোক এসে হাজির হলো। সে বলা শুরু করল,

'জনাব আপনি কি ফরজ সালাত আদায় করতে যাচ্ছেন নাকি নফল? যদি নফল হয় তাহলে সেটা কি এখন আদায় করা জরুরি?'

অথবা ধরুন, আপনি সিয়াম পালন করছেন। কোনো এক ফাঁকে চোর এসে ঘরের সব টাকাপয়সা নিয়ে গেল। সকালে হতভম্ব হয়ে বসে আছেন। অফিসে ফোন দিয়ে জানালেন আজ আসতে পারবেন না। কিছুক্ষণ পর কলব্যাক করল অফিসের বস। তারপর ফোনের ওপাশ থেকে ভুঁড়িতে হাতে বোলাতে বোলাতে বলল, 'রোযা কি ফরয ছিল নাকি নফল? রোযা ভেঙে ফেলো।' কারণ সে ভাবছে রোযা রেখে আপনি কাজে মন দিতে পারবেন না। আর কাজে মন দিতে না পারলে তার ক্ষতি হবে।

আপনি তার এ কথা মেনে নেবেন?

যারা আজ সারা পৃথিবীজুড়ে ফাসাদ সৃষ্টি করছে তাদের অবস্থা এমনই। যে নারীকে আল্লাহ ﷻ সম্মানিত করেছেন তাদের দেহ নিয়ে এরা ব্যবসা করে। এরা একদিকে তরুণদের প্রবৃত্তিকে উস্কে দেয়, অন্যদিকে বিয়েকে কঠিন বানিয়ে রাখে। এরা মানুষের সম্পদ, দেশের সম্পদ লুটপাট করে আর তারপর বিক্রি করে দেয় আন্তর্জাতিক শাসকগোষ্ঠীর কাছে।

যে বিষয়গুলোর হেফাযতের জন্য শরীয়াহ নাযিল হয়েছে, দ্বীন, আক্বল, সম্মান,

জীবন, সম্পদ, তার সবকিছু এরা বিপন্ন করে ফেলেছে। এতসব অপরাধের পর এরা নির্লজ্জের মতো 'নিকাব করার নেতিবাচক দিক' নিয়ে আমাদের লেকচার দিতে আসে? আর আমরা তখন নির্বোধের মতো তর্ক শুরু করি, 'আচ্ছা নিকাব করা ওয়াজিব নাকি মুস্তাহাব?'

এটা কেমন নির্বুদ্ধিতা? কোনো পর্যায়ের আহাম্মকি?

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন :

كان مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت

পূর্ববর্তী নবীগণের কথা থেকে মানুষ যা কিছু শিখেছে, তার অন্যতম হলো, যদি তোমার লজ্জা না থাকে, তবে যা ইচ্ছা করো। [১০]

[১০] সহিহ বুখারী, ৬১২০, ৩৪৮৪

অণু পরিমাণ ঈমান?

কিছুদিন আগের কথা। স্কুল থেকে ফেরার পরপরই প্রশ্ন নিয়ে হাজির হল আমার ছেলে। স্কুলে টিচারের কাছ থেকে একটি হাদিস শুনেছে। প্রশ্ন সেই হাদিস নিয়ে। হাদিসটি বিখ্যাত। আপনারা সবাই শুনে থাকবেন। হাদিসটি হলো,

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

خرج من النارِ من كان في قلبِهِ مثقالُ ذرةٍ من الإيمانِ

যার অন্তরে সামান্যতম ঈমান আছে, সে (কোন এক সময়) জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে।[১১]

আমার ছেলে প্রশ্ন করল, 'আব্বু! এখানে কি ওইসব মানুষদের কথা বলা হচ্ছে, আল্লাহকে নিয়ে যাদের সন্দেহ আছে? আল্লাহ্ আছেন কি না সেটা নিয়ে যারা নিশ্চিত না, আবার কিছুটা বিশ্বাসও আছে, ওরাও কি জান্নাতে যাবে?

'না, অবশ্যই না।'

'তাহলে হাদিসে কাদের কথা বলা হচ্ছে?'

ওর প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য চটজলদি করে কয়েকজনের আলিমের কাছ থেকে বিষয়টি জেনে নেয়ার চেষ্টা করলাম।

অন্তরে সরিষাদানা পরিমাণে ঈমান থাকলেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁকে জাহান্নামের আগুন থেকে বের করে আনবেন, এই হাদিসটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

এ ব্যাপারে যে হাদিসগুলো আছে তার সবগুলো সহিহ।

---

[১১] সুনান আত-তিরমিযী, ২৫৯৮

আমার প্রশ্নের জবাবে একজন বললেন, 'এর অর্থ হলো, তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাদের অন্তরে কিছু সন্দেহ আছে। তারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তবে সেই বিশ্বাসে কিছু সংশয় মেশানো আছে।'

'এটা তো ঈমান হলো না। সংজ্ঞানুযায়ী ঈমান অর্থ দৃঢ় বিশ্বাস। দৃঢ় বিশ্বাস না থাকলে সেটা ঈমান হতে পারে না', আমি বললাম।

তিনি আর কিছু না বলে চুপ হয়ে গেলেন।

আরেকজন বললেন, 'এর অর্থ হলো তারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, কিন্তু আর কিছু করে না। তারা কোনো হুকুম-আহকাম মেনে চলে না। তাদের শুধু বিশ্বাসটাই আছে।'

আমি বললাম, 'তাহলে তো ইবলিসও আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী। কিন্তু সে আল্লাহর আনুগত্য করে না। ওর কী হবে?'

তিনিও চুপ হয়ে গেলেন।

এ কথোপকথনগুলোর পর আমার মনে হলো শুধু শিশুরা না, বড়দের মাঝেও এ হাদিসের অর্থ নিয়ে কনফিউশান আছে। এ হাদিসের অর্থ আমাদের অনেকের কাছেই আসলে স্পষ্ট না।

আসুন আমরা হাদিসটির সঠিক অর্থ জানার ও বোঝার চেষ্টা করি। সহীহ হাদিসে এসেছে, কারো অন্তরে অণু পরিমাণ বা সরিষাদানা পরিমাণে ঈমান থাকলে আল্লাহ ﷻ তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বের করে আনবেন।

এ হাদিসটি আসলে অন্তরের আমলের সাথে সম্পর্কিত। এখানে অন্তরের আমলের দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। অন্তরের আমল কী?

অন্তরের আমল হলো আল্লাহর জন্য ভালোবাসা, আল্লাহর ওপর ভরসা করা, তাঁকে মহিমান্বিত করা, তাঁর প্রশংসা করা, তাঁকে ভয় করা, আল্লাহর রাহমাহ ও ক্ষমাশীলতার ব্যাপারে আশা রাখা।

অন্তরের আমলগুলোর বিভিন্ন পর্যায় বা লেভেল আছে। যেমন ধরুন, আল্লাহকে ভালোবাসা। এই ভালোবাসার কিন্তু অনেক পর্যায় হতে পারে। যেমন একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের ভালোবাসা। একেবারে সর্বনিম্ন পরিমাণ। যার অন্তরে এটুকু আছে, সে আল্লাহকে ভালোবাসে, কিন্তু সেই ভালোবাসা বেশ দুর্বল।

লক্ষ করুন!

এই ভালোবাসার ভ্যালু কিন্তু নেগেটিভ না। অর্থাৎ সে আল্লাহকে ঘৃণা করে না। এই ভালোবাসার ভ্যালু নিউট্রালও না। অর্থাৎ ভালোওবাসে না আবার ঘৃণাও করে না, ব্যাপারটা এমন না। তার ভালোবাসা পযিটিভ। অন্তরে রাব্বুল আলামীনের প্রতি ভালোবাসা আছে, যদিও সেটা খুব দুর্বল।

এই ভালোবাসা দুর্বল হলেও, এটা তাকে কুফর থেকে বাঁচিয়ে রাখে। এবং এ ভালোবাসার কারণে একসময় সে জান্নাতে যাবে। তবে এ ভালোবাসা তাঁকে গুনাহ বা আখিরাতের শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারবে না। গুনাহ থেকে বাঁচতে হলে আবশ্যিক পরিমাণ ভালোবাসা লাগবে।

আবশ্যিক ভালোবাসা কী?

আল্লাহ ﷻ সূরা তাওবাহয় বলেন,

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

'বলো, (হে মুহাম্মদ),

যদি তোমাদের পিতারা, আর তোমাদের সন্তানেরা, আর তোমাদের ভাইয়েরা, আর তোমাদের স্ত্রীরা, আর তোমাদের গোষ্ঠীর লোকেরা আর ধন-সম্পদ, যা তোমরা অর্জন করেছ, আর ব্যবসা, তোমরা যার মন্দার ভয় করো, আর বাসস্থান, যা তোমরা ভালোবাসো (এসব) যদি তোমাদের কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে জিহাদ করার চেয়েও অধিক প্রিয় হয় তবে তোমরা অপেক্ষা করো আল্লাহ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না। [তরজমা, সূরা তাওবাহ, ২৪]

অর্থাৎ আল্লাহ ﷻ এখানে আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন, ফাসিক হওয়া থেকে বাঁচতে হলে, গুনাহ ও শাস্তি থেকে বাঁচতে হলে আল্লাহর প্রতি এই পরিমাণ ভালোবাসা থাকতে হবে। আবশ্যিক ভালোবাসার পর্যায়ে পৌছাতে হলে এ আয়াতে আল্লাহ ﷻ যে বিষয়গুলোর কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলোর চেয়ে আল্লাহর আদেশ পালনকে বেশি ভালোবাসতে হবে। আর এই আবশ্যিক ভালোবাসার পরে আছে পরিপূর্ণ ভালোবাসা বা পরম ভালোবাসা। নবীগণ عليهم السلام, সিদ্দিকগণ এবং ঈমানের পথে যারা অগ্রগামী তাঁরা অন্তরে আল্লাহর প্রতি এই পরিপূর্ণ ভালোবাসা ধারণ করেন।

আল্লাহভীতি বা আল্লাহকে মহিমান্বিত করার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই রকম। এমন কিছু মানুষ থাকে, যাদের মনে আল্লাহর ভয় আছে। যারা আল্লাহর প্রশংসা করে, তাঁকে মহিমান্বিত করে। কিন্তু এগুলোর পরিমাণ খুবই কম। যতটুকু না থাকলেই না।

লক্ষ করুন! তারা আল্লাহকে ভয় করে। তাদের অন্তরে আল্লাহর প্রতি ঘৃণা বা অবজ্ঞা নেই। তারা আল্লাহকে নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য কিংবা বিদ্রুপ করে না। তারা আল্লাহকে অস্বীকার করে না, তাকে চ্যালেঞ্জ করে না।

তারা আল্লাহর ব্যাপারে উদাসীনও না। ব্যাপারটা এমন না যে, তারা আল্লাহকে ভয়ও করে না আবার ঘৃণা বা চ্যালেঞ্জও করে না।

তাদের আল্লাহর প্রতি ভয় আছে। তবে তার পরিমাণ খুবই কম। অন্তরের এই অল্প আমল তাদের কুফর থেকে বাঁচাতে পারলেও গুনাহ থেকে রক্ষা করতে পারে না। আল্লাহর বিধানগুলো তাঁরা পরিপূর্ণভাবে মেনে চলে না।

গুনাহ থেকে বাঁচতে হলে তাদের আবশ্যিক পরিমাণ আল্লাহভীতি থাকতে হবে, যা তাদের চালিত করবে ফরজ কাজগুলো আন্তরিকভাবে করতে, বড় বড় গুনাহগুলো থেকে বেঁচে থাকতে এবং ছোট-বড় যেকোনো গুনাহের জন্যে তাওবাহ করতে।

ঈমানের আরও ওপরের পর্যায়ে যেতে হলে আল্লাহর ব্যাপারে পরিপূর্ণ ভয় অর্জন করতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য অন্তরের অন্য আমলগুলোর ক্ষেত্রেও।

কাজেই হাদিসে 'অণু পরিমাণ ঈমান' বা 'সরিষাদানার পরিমাণ ঈমান' বলতে শুধু আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকে বোঝানো হচ্ছে না; বরং অন্তরের আমলগুলোর কথাও বলা হচ্ছে।

অবশ্যই ঈমান আর ইয়াক্বিন এর মধ্যে পার্থক্য আছে। কিন্তু যে বিশ্বাসের মধ্যে সন্দেহ মিশে আছে ইসলামের অবস্থান থেকে সেটা কোনো বিশ্বাসই না। সন্দেহ-মিশ্রিত বিশ্বাসকে ঈমান বলা যায় না। লক্ষ করুন, এখানে আমরা ঈমানের সংজ্ঞার কথা বলছি না। ঈমানের সংজ্ঞার মধ্যে আমলের অন্তর্ভুক্তি নিয়েও কথা হচ্ছে না। সেটা আলাদা একটা আলোচনা এবং এ নিয়ে অনেক দলীল আছে। ঈমান থেকে কোনোভাবেই আমলকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। তবে আমাদের এ আলোচনার বিষয় ছিল অন্তরের আমল। এবং আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। আল্লাহর আপনাদের ওপর শান্তি ও কল্যাণ বর্ষণ করুন।

অজুহাত

'অমুক মহিলা হিজাব করে তমুক তমুক কাজ করে বেড়ায়। সে হিজাবের অপমান করছে!'

'কাণ্ড দেখেছ! মুখে এত লম্বা দাড়ি আর কাজ এই রকম। এরা তো দাড়ির মর্যাদা নষ্ট করছে।'

এ ধরনের কথা আমরা প্রায়ই শুনি, তাই না? আমরা অনেকে এ ধরনের কথা বলেও ফেলি। কিন্তু কথাগুলো আর এর পেছনের যুক্তিগুলো ঠিক না। ইসলামের সম্মান বা ভাবমূর্তি কেউ নষ্ট করতে পারে না। ইসলামের চিহ্ন বা শিয়ারগুলোর মর্যাদা কমানো কারও পক্ষে সম্ভব না। কেউ আক্রমণ করতে পারে, ইসলামের ব্যাপারে কুৎসা রটাতে পারে। কিন্তু তাতে ইসলামের সম্মান, মর্যাদা এক বিন্দু কমে না। হিজাব করা কিংবা দাড়িরাখা লোকের অপরাধের কারণে ইসলামের কোনো ক্ষতি হয় না।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

مَّنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِۦ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

যে সঠিক পথে চলবে সে তার নিজের কল্যাণের জন্যই সঠিক পথে চলবে, আর যে গুমরাহ হবে তার গুমরাহীর পরিণাম তার নিজের ওপরেই পড়বে। কোনো বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না। [তরজমা, সূরা আল-ইসরা, ১৫]

এবং তিনি বলেন,

مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِۦ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ

যে সৎকাজ করবে নিজের কল্যাণেই করবে; যে অসৎ কাজ করবে তার পরিণতি তাকেই ভোগ করতে হবে। তোমার প্রতিপালক বান্দাদের প্রতি যালিম নন। [তরজমা, সূরা হা-মীম-আস-সাজদা, ৪৬]

এখন আবার বলে বসবেন না যেন, 'আরে, আপনি তো কথা বোঝেনইনি। আক্ষরিক অর্থের ওপর এত জোর দেয়া যাবে না। বক্তা কী বোঝাতে চাচ্ছে সেটা বোঝার চেষ্টা করুন।'

কারণ, এ ধরনের কথার পেছনে উদ্দেশ্য সাধারণত ভালো হয় না। দ্বীনের ব্যাপারে উদাসীন লোকেরা তাদের উদাসীনতা আর অবহেলাকে জায়েজ করার জন্য এ ধরনের কথা বলে।

> *'অমুক যেহেতু নামায পড়ে আবার ঘুষও খায়, তাই আমি নামায পড়ব না। কিন্তু নামায না পড়লেও আমি কিন্তু ঘুষ খাই না। আমার মধ্যে দ্বিমুখিতা নেই।'*
>
> *'অমুক যেহেতু হিজাব করে ডেটিংয়ে যায়, তাই আমি হিজাব করব না। আমি তো শালীনতা বজায় রেখেই চলাফেরা করি। আমার মন পরিষ্কার।'*
>
> *'মৌলবিরা তো সারাদিন কুরআন-হাদিস নিয়ে থাকে, আবার পত্রিকায় দেখি মাদরাসায় ধর্ষণ হয়। কাজেই অত কুরআন-হাদিস মানার দরকার নেই। সবকিছুতে কুরআন-হাদিস টেনে সিদ্ধান্ত নিতে পারব না। তবে আমার মনে ভক্তি-বিশ্বাস আছে। আমি ওসব মৌলবিদের মতো না।'*

এ ধরনের কথা বলা লোকগুলো কি আসলে ইসলাম নিয়ে আন্তরিক চিন্তা আর উদ্বেগের জায়গা থেকে এগুলো বলে? নাকি কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনার অজুহাত দিয়ে নিজেদের খেয়ালখুশি আর সীমালঙ্ঘনকে জায়েজ করতে চায়?

শিক্ষিত লোকদের অনেকেই দুর্নীতিবাজ হয়, তাই আপনি পড়াশুনা করবেন না? অনেকে ঘুষ খায় আবার দানও করে, তাই আপনি দান করা ছেড়ে দেবেন? অনেকের আচরণ সামনাসামনি খুব ভালো, কিন্তু পেছনে গীবত করে। তাই আপনি এখন সবার সাথে খারাপ আচরণ করবেন? এগুলো কি সুস্থ কোন মানুষের কথা হতে পারে? অথচ আল্লাহর হুকুমের ব্যাপারে কিন্তু এসব কথাই বছরের পর বছর বলা হচ্ছে। কেউ দাড়ি রেখে, কিংবা হিজাব রেখে কোন গুনাহর কাজ করলে তাতে আল্লাহর হুকুম পালন করার বাধ্যবাধকতা তো বদলে যায় না। আরেকজন কী করলো তাতে আমার দায়িত্ব, আমার হিসেব তো বদলাবে না। এসব কথা আসলে আল্লাহর অবাধ্যতা করার জন্য দুর্বল অজুহাত ছাড়া আর কিছুই না।

যে হিজাব করতে চায় না, সে নিজের অবাধ্যতাকে জায়েজ করার জন্য এসব কথা বলে। যে দাড়ি রাখতে চায় না, সে নিজের অপরাধবোধকে ঢাকার জন্য এসব অজুহাত দেয়। আল্লাহর প্রতি নিজেদের অবাধ্যতাকে আড়াল করার জন্য সে আরেকজনের অপরাধের ফিরিস্তি টানে।

তাছাড়া কারও খারাপ কাজের কারণে যদি নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয় তাহলে একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো ভালো কাজের মাধ্যমে তা দূর করে দেয়া। এ জন্য আমি ইসলামের একটা বিধান পালন করা ছেড়ে দেব, এটা কোন ধরনের যুক্তি? কেমন বিবেচনা? কেউ দাড়ি রেখে ঘুষ খায়। আপনার দায়িত্ব হলো দাড়ি রাখার পর এমনভাবে নিজের আচরণকে উন্নত করা, যাতে ঘুষখোরের কারণে মানুষের মনে যে খারাপ ধারণা হয়েছিল সেটা আপনাকে দেখার পর চলে যায়। তবে আবারও মনে করিয়ে দিই যে, প্রত্যেকে তার নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করবে। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

হে মুমিনগণ, তোমাদের ওপর তোমাদের নিজেদের দায়িত্ব। যদি তোমরা সঠিক পথে থাকো তাহলে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না... [তরজমা, সূরা আল-মা'ইদা, ১০৫]

যদি আমি সীরাতুল মুস্তাকীমের ওপর থাকি, আল্লাহ ﷻ আমাকে যে যে হুকুম করেছেন সেগুলো সঠিকভাবে মেনে চলি, তাহলে কে কী করল তাতে আমার কোনো ক্ষতি হবে না। এটাই আল্লাহর ফায়সালা। আর যে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখে তাঁর জন্য এই ফায়সালা যথেষ্ট।

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ। [তরজমা, সূরা আল-মুদাসসির, ৩৮]

স্বীকারোক্তি

শয়তানের সবচেয়ে ভয়ংকর চক্রান্তগুলোর একটা কী জানেন?

সে আপনাকে এমন একটা মানসিক অবস্থায় নিয়ে যাবে যখন কেউ আপনাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিলে আপনি তার ওপর ক্ষিপ্ত হন। আর এর কারণে আল্লাহর রাহমাহ থেকে বঞ্চিত হন।

কেউ যখন আপনাকে বলে,

ভাই, এ কাজটা হারাম!

তখন আপনি বলেন,

> 'ভাই! দয়া করে আমাকে আমার মতো থাকতে দাও। মানুষের ভুল ধরা ছাড়া তোমার কি আর কোনো কাজ নেই? আগে নিজেকে শুধরাও। নিজের ভুল নিয়ে মাথা ঘামাও। তুমি না আগে অমুক অমুক করে করে বেড়াতে? আজ তুমি আমাকে জ্ঞান দিচ্ছ? তুমি তো ইসলামকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করছ। তোমার নাসীহাহ করার পদ্ধতি ঠিক না।'

যখন আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় তখন এ রকম প্রতিক্রিয়া হওয়া ঠিক না। মানুষের অতীতের কথা টেনে এনে তাকে খোঁটা দেয়াও অত্যন্ত গর্হিত কাজ। তবে এতটুকু বললে সেটা তাও একটা সীমার মধ্যে থাকে।

সমস্যা হলো, যখন এটা পরের লেভেলে চলে যায়। যখন আপনি বলেন,

> 'শোনো, আমি যা করছি সেটা ঠিকই আছে। ইসলামের ব্যাপারে তোমাদের সংকীর্ণ বুঝের কারণে তুমি এটাকে হারাম বলছ। আগের যুগের আলিমদের কথা মেনে চলতে আমি বাধ্য না। এ বিষয়ে তাদের ইজমা থাক বা না থাক, সেটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ না। তাদের সময় চলে গেছে। এখন আধুনিক যুগ। এ যুগে চলার পথ

আমাদের নিজেদেরই ঠিক করে নিতে হবে।'

এ পর্যায়ে এসে শয়তান আপনাকে সীমালঙ্ঘনের নতুন এক স্তরে নিয়ে যায়।

প্রথমে আপনি কেবল নাসীহাহ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এবার সেখান থেকে আপনি চলে গেলেন সত্যকে প্রত্যাখ্যান করায়।

কুরআনের সঠিক বুঝ কোনটা? একটা বুঝই কি সঠিক কি না..., এই আলোচনাগুলো করার জায়গা এটা না। কিন্তু যে মানুষগুলো এভাবে কথা বলে তারা কি আসলে ইলমী জায়গা থেকে এই বিরোধিতা করে?

না।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় এমন কথা বলা মানুষরা চালিত হয় আবেগ, কামনা-বাসনা, খেয়াল-খুশি, হতাশা, রাগ ইত্যাদি দিয়ে। নিজেদের খেয়াল-খুশি, কামনা-বাসনা কিংবা আবেগের কারণে তারা দ্বীনের সুস্পষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত অবস্থান প্রত্যাখ্যান করে। তারপর সেটার বৈধতা আর অজুহাত খুঁজে বেড়ায় নানান অন্ধকূপে।

যতক্ষণ না তারা নিজেদের অন্তরের এই সমস্যাগুলোর সমাধান করছে, ততক্ষণ তাদের সাথে ইলমী আলোচনায় গিয়ে কোনো লাভ নেই।

প্রিয় পাঠক, কখনো নিজের ভুল, নিজের পাপের পক্ষে যুক্তি খুঁজবেন না। কখনো এই পর্যায়ে নামা যাবে না। এর ফলে আপনি নিজেকে আল্লাহর রহমত থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবেন। কিন্তু বিনিময়ে কিছুই পাবেন না।

যতক্ষণ আপনি পাপকে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করেননি, ততক্ষণ গুনাহ করা সত্ত্বেও আপনি আল্লাহর রহমতের কাছাকাছি ছিলেন। দেখুন আল্লাহ ﷻ কী বলেছেন,

وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

আর অন্য কিছু লোক তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে, সৎকর্মের সঙ্গে তারা অসৎকর্মের মিশ্রণ ঘটিয়েছে। আশা করা যায়, আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [তরজমা, সূরা আত-তাওবাহ, ১০২]

ইবনু কাসীর ﷺ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন,

এ আয়াতটি কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তির ব্যাপারে অবতীর্ণ হলেও এর অর্থ ব্যাপক এবং সমস্ত অপরাধী ও পাপী মু'মিনের ব্যাপারেই এটা প্রযোজ্য।

কথাগুলো আবার পড়ুন।

গুনাহগার, অপরাধী বান্দা, যারা ভালো আর মন্দ আমলের মিশ্রণ ঘটিয়েছে, আশা করা যায়, আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

কিন্তু এই ক্ষমা পাওয়ার শর্ত আছে। কী সেই শর্ত? আল্লাহ ﷻ বলছেন,

(তারা) তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে

আমি বলছি না যে আমার কাছে এসে নিজের গুনাহগুলো স্বীকার করুন। যে আপনাকে নাসীহাহ করছে সেও চায় না যে তার কাছে আপনি আপনার গুনাহ স্বীকার করুন।

... তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে

এ অংশের ব্যাখ্যায় ইবনু কাসীর ﷺ বলেছেন,

অর্থাৎ তারা নিজেদের দোষ ও অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে। তারা নিজেদের কাছে এবং তাদের প্রতিপালকের কাছে এ গুনাহ স্বীকার করেছে।

আমার কাছে বলার দরকার নেই। কোনো মানুষের কাছে কিচ্ছু বলার দরকার নেই। বিষয়টা আপনার আর আপনার রবের মাঝে। আমাদের ধর্ম ক্যাথলিকদের ধর্মের মতো না, যেখানে আপনি পাদরিদের কাছে গিয়ে নিজের পাপের স্বীকারোক্তি দেবেন আর তারা 'আল্লাহর পক্ষ হয়ে' জানাবে যে আপনার পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। আমরা পাপমুক্তির সার্টিফিকেটের ব্যবসা করি না। আপনার যেমন গুনাহ আছে, তেমনি আমার নিজেরও গুনাহ আছে। আমার কাছে কিছু বলার দরকার নেই। কিন্তু যে জিনিসটা আমাকে আল্লাহর রাহমাহ পাবার সবচেয়ে বেশি আশা দেয় তা হলো আমি আমার গুনাহ স্বীকার করি।

তাই আমার ভাইবোনেরা, তাওবাহ করুন আপনার প্রতিপালকের কাছে। প্রশংসা ও মহত্ত্ব তাঁরই। কিন্তু হাতজোড় করে অনুরোধ করছি, কখনও নিজের গুনাহকে বৈধ প্রমাণ করতে যাবেন না। কখনো সেগুলো জায়েজ মনে করবেন না এবং দ্বীনের এমন কিছু অস্বীকার করে বসবেন না যেগুলো যরুরিয়্যাতে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। আলিমরা নবী ﷺ-দের ইলমের উত্তরাধিকারী, এই উত্তরাধিকার অস্বীকার করবেন না। এবং সালাফ

আস সালেহিনের দিকনির্দেশনার বিরোধিতা করবেন না।

আপনার অপছন্দের কেউ আপনার ভুল ধরিয়ে দিলে চুপ থাকুন। সেটাই উত্তম। চুপ থেকে নিজের অবস্থা যাচাই করে দেখুন। দেখুন আসলেই ভুল করছেন কি না।

যদি এটা না পারেন, যদি ভুলবশত তাকে কড়া কথা শুনিয়ে দেন, তার কোনো অতীত ভুলের কথা মনে করিয়ে তাকে খোঁটা দেন, তাহলে অনুতপ্ত হন। তাওবাহ করুন। তার কাছে ক্ষমা চান। কারণ, আপনি তার ওপর যুলুম করেছেন।

কিন্তু আল্লাহর নামে বলছি, যাই হোক না কেন, কোনো অবস্থাতেই নিজের ভুলকে ঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন না। অজুহাত দেবেন না। নিজের পাপের বৈধতা আবিষ্কারের চেষ্টা করবেন না। নিজেকে ওই রাহমাহ থেকে বঞ্চিত করবেন না, যার কথা আল্লাহ তার কালামে উল্লেখ করেছেন,

> *...আশা করা যায়, আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [তরজমা, সূরা আত-তাওবাহ, ১০২]*

দীপ জ্বেলে যাই

'আমাকে ইসলাম পালনে সাহায্য করার মতো কেউ নেই। আমাকে দ্বীনের পথে অবিচল থাকতে সহায়তা করার মতো কাউকে আমি আশেপাশে পাই না।'

অভিযোগটা কমন। প্রায়ই আমরা এ ধরনের কথা শুনি। এসব ক্ষেত্রে আমার মনে কিছু প্রশ্ন জাগে-

আপনি কেন আরেকজনের জন্য অপেক্ষা করে আছেন? এভাবে আর কতদিন অপেক্ষায় থাকবেন? কেন আপনি নিজেই নিজের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলছেন না? কেন আপনি ওই শাখাপ্রশাখাগুলোর বিকাশে মনোযোগী হচ্ছেন না, যা আপনার জন্য ছায়া হবে? যারা হবে আপনার সহায় ও শক্তি?

রাসূল ﷺ এবং তাঁর সাহাবী -দের এর বর্ণনায় আল্লাহ ﷻ কী বলেছেন লক্ষ করুন:

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

*মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। আর যারা তাঁর সাথে আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর আর পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত সদয়... **[তরজমা, সূরা আল-ফাতহ, ২৯]***

তারপর এই আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ

*...তাদের দৃষ্টান্ত হলো, একটি চারাগাছের মতো। যা তার কচিপাতা উদ্গত করেছে ও শক্ত করেছে। এরপর তা পুষ্ট হয়েছে ও স্বীয় কাণ্ডের ওপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়েছে...। **[তরজমা, সূরা আল-ফাতহ, ২৯]***

মুহাম্মদ ﷺ নিজেই তাঁর পরিবেশ গড়ে নিয়েছিলেন। তিনি চারাগাছ লাগিয়েছেন এবং

সেই শেকড় প্রোথিত হয়েছে গভীরে। তারপর সেই শেকড়,

'শক্ত করেছেন'—অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবী ﷺ-গণ একে অপরকে সাহায্য করেছেন। এবং পরস্পর আগলে রেখেছিলেন। এবং,

'অতঃপর তা পুষ্ট হয়েছে'—অর্থাৎ, তারা পরস্পরের সহায়তায় গড়ে উঠেছেন দৃঢ় ও মজবুত হয়ে। যার ফলে তাঁরা সহজে ভেঙে পড়বেন না। ঠিক যেমন এক আঁটি তির একসাথে ধরে ভাঙা যায় না। কিন্তু একটি করে একটি করে নিলে সহজেই ভেঙে ফেলা যায়।

'স্বীয় কাণ্ডের ওপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়েছে'—অর্থাৎ যখন একজনের ওপর চাপ পড়ে তখন বাকিরা সাহায্যে এগিয়ে আসে। যার ফলে একসময় সবাই মিলে একসাথে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়।

এ কথাগুলো শোনার পর কেউ বলতে পারেন, 'আমাকে দিয়ে এসব হবে না, আমি তো আর নবী না!'

কিন্তু দেখুন মহান আল্লাহ ﷻ কী বলেছেন :

قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ

অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ...। [তরজমা, সূরা আল-আহযাব, ২১]

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

...আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে তাঁর জন্যে আল্লাহ যথেষ্ট...। [সূরা আত-তালাক, ৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের চারপাশকে বদলে দিয়েছিলেন। গড়ে তুলেছিলেন নিজের পছন্দের পরিবেশ এবং তিনি ﷺ বলেছেন,

احْرِصْ على ما يَنْفَعُكَ، واسْتَعِنْ باللهِ

যা কিছু তোমার উপকারে আসে, সেসবের প্রতি সচেষ্ট হও এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও।[১২]

ঠিক যেমন আকাশ থেকে এক সকালে সোনা-রুপার বৃষ্টি শুরু হবে না তেমনি অনুকূল

---

[১২] সহিহ মুসলিম, ২৬৬৪

পরিবেশও নিজ থেকে তৈরি হবে না। তাই দ্বীনের পথে চলার জন্যে, ইসলামের ওপর সুদৃঢ় থাকার জন্য সঙ্গীর অপেক্ষায় বসে থাকলে চলবে না; বরং নিজের পরিবেশ নিজেই গড়ে তুলুন।

নির্জন যুদ্ধ

সূরা আল আন'আমে, আল্লাহ ﷻ আমাদের বেশ কিছু আদেশ দিয়েছেন। তার মধ্যে একটি আদেশ নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন,

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

অশ্লীল কাজের নিকটবর্তী হবে না, তা থেকে যা প্রকাশ পায় এবং যা গোপন থাকে। [তরজমা, সূরা আন'আম, ১৫১]

অশ্লীলতা শব্দটি দিয়ে এখানে গুনাহ বোঝানো হচ্ছে। বিশেষ করে কবীরাহ গুনাহগুলোর কথা বলা হচ্ছে।

এখানে দুটো বিষয় নিয়ে আমাদের গভীরভাবে ভাবা দরকার। প্রথমত, আল্লাহ ﷻ কিন্তু বলেননি, *'অশ্লীল কাজ করবে না'*; বরং তিনি বলছেন, *'অশ্লীল কাজের নিকটবর্তী হবে না'*।

অর্থাৎ আল্লাহ ﷻ আমাদের শুধু গুনাহ থেকে দূরে থাকতে বলছেন না; বরং তিনি এমন সবকিছু থেকে দূরে থাকতে বলছেন, যা আমাদের বড় গুনাহগুলোর দিকে নিয়ে যেতে পারে। এমন কোনো কিছু করা যাবে না যা গুনাহগুলোর দূরত্ব কমিয়ে আনবে। এমন কিছু করা যাবে না, যা আমাদের আর গুনাহগুলোর মাঝখানের প্রাচীরগুলো সরিয়ে দেবে।

যেমন, বিপরীত লিঙ্গের কারও দিকে ইচ্ছে করে তাকানো মানুষকে বড় গুনাহের দিকে এগিয়ে দেয়। নির্জনে দুজন নারী ও পুরুষের একসাথে থাকা তাদের বড় গুনাহের কাছে নিয়ে যায়। গান শোনা মানুষের কামনাকে উস্কে দেয়, মনকে তরল করে।

সুতরাং ইচ্ছাকৃতভাবে এ কাজগুলো করা হলো আল্লাহর আদেশ অমান্য করা। যারা এ

কাজগুলো করছেন তারা গুনাহ করছেন।

এটা হলো প্রথম বিষয়।

দ্বিতীয়ত, এই আয়াতে আল্লাহ ﷻ গোপনে করা অশ্লীলতার কথা বলেছেন। তিনি বলেন,

'অশ্লীল কাজের নিকটবর্তী হবে না, তা থেকে যা প্রকাশ পায় এবং যা গোপন থাকে।'

অনেক মুফাসসিরিনের মতে 'গোপনে করা অশ্লীলতা' বলতে ওইসব কবীরাহ গুনাহকে বোঝানো হচ্ছে, যেগুলো গোপনে সংঘটিত হয়। এ ব্যাখ্যাটি সঠিক। তবে মুফাসসিরগণ আরও একটি ব্যাখ্যা এনেছেন। এ ব্যাখা অনুযায়ী আমাদের অন্তরের গুনাহগুলোও গোপন অশ্লীলতার মধ্যে পড়ে।

কাজেই রিয়া (লোকদেখানো আমল) একটি গোপন অশ্লীলতা। মানুষের কাছে প্রশংসা পাওয়ার জন্য দান-সাদকা করা, নিজের লাইক কিংবা ফলোয়ার বাড়াবার জন্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো দাওয়াতি লেখা কিংবা লেকচার শেয়ার করার মতো কাজগুলো আজ আমাদের মধ্যে মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। এ সবই রিয়া এবং গোপন অশ্লীলতার অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহর নাযিল করা বিধানকে ঘৃণা করা, ইসলামের কোনো শিয়ার বা চিহ্নের প্রতি অন্তরে বিদ্বেষ থাকাও এ আয়াতে বর্ণিত গোপন অশ্লীলতার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর ফায়সালা নিয়ে অসন্তুষ্ট হওয়া এবং ক্ষুব্ধ হওয়াও গোপন গুনাহ। একই ভাবে ঔদ্ধত্য ও দম্ভ গোপন অশ্লীলতার অন্তর্ভুক্ত।

আমাদের মনে রাখতে হবে, অনেক সময় অন্তরের গোপন অশ্লীলতা প্রকাশ্য অশ্লীলতার চেয়েও ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে।

আপনারা কি নবীজি ﷺ-এর এই হাদিসটি শোনেননি?

لا يدخلُ الجنَّةَ مَن كانَ في قلبِهِ مثقالُ حبَّةٍ مِن خردلٍ مِن كِبرٍ

যে ব্যক্তির অন্তরে সরিষাদানা পরিমাণ অহংকারবোধ থাকবে, সে কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[১৩]

তাই সূরা আন'আমের এ আয়াতের অর্থ বুঝলে আমরা বুঝতে পারব আলিমগণ

[১৩] মুসলিম, ৯১; ইবনু মাজাহ, ৪১৭৩; আবু দাউদ, ৪০৯১; তিরমিযী, ১৯৯৮

'অপ্রকাশিতর হেফাযত' বলতে কী বুঝিয়ে থাকেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার একটি নাম, 'আর-রাক্বিব' (তত্ত্বাবধায়ক, মহা পর্যবেক্ষক)। এ নামের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম ﷺ বলেছেন:

'বান্দা যখন অনুধাবন করে তার প্রকাশ্য ও গোপন সব আমলের ব্যাপারে আল্লাহ জানেন এবং এ বিষয়টির ব্যাপারে যদি সে সব সময় সচেতন থাকে, তাহলে এ চিন্তা তাকে বাধ্য করবে নিজের গোপন চিন্তাগুলোকে এমন-সব চিন্তা এবং ইঙ্গিত থেকে বিরত রাখতে, যা আল্লাহর অপছন্দনীয়।'

পরীক্ষা কিংবা কষ্টের সময় আল্লাহর ফায়সালা নিয়ে অসন্তুষ্ট হওয়া যাবে না। আল্লাহকে দোষারোপ করা যাবে না; বরং সব সময় এ ধরনের চিন্তার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে এবং বেশি বেশি ইস্তিগফার করতে হবে। কারণ, এ ধরনের চিন্তাগুলো হলো একধরনের গোপন অশ্লীলতা।

প্রকাশ্য গুনাহগুলোর মতোই গোপন গুনাহগুলোর জন্যেও আমাদের তাওবাহ করতে হবে। আর যদি বান্দা আন্তরিকভাবে তাওবাহ করে তাহলে সংশোধনের পথে আল্লাহ্ ﷻ তাকে সাহায্য করবেন এবং তার তাওবাহ কবুল করে নেবেন।

প্রিয় পাঠক, গোপন অশ্লীলতা থেকে আমাদের চিন্তাগুলোকে রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কেননা এ ধরনের গুনাহে লিপ্ত মানুষকে বাইরে থেকে দেখে মুত্তাকী মানুষ মনে হতে পারে। মানুষ হয়তো তাকে দেখে ভাববে সে অনেক যাহিদ, অনেক আবেদ একজন বান্দা। আর তার ব্যাপারে মানুষের ধারণা আরও পাকাপোক্ত হবে যেহেতু সে প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে ভয়ংকর গুনাহ করে যাচ্ছে। সে মানুষের প্রশংসা, খ্যাতির পেছনে ছোটে, অথবা সে আল্লাহর ফায়সালা নিয়ে অসন্তুষ্ট। অথবা সে হয়তো আল্লাহর কোনো বিধানকে ঘৃণা করে।

আমরা আল্লাহ ﷻ-এর কাছে দু'আ করি তিনি যেন আমাদের এ ধরনের গোপন গুনাহ থেকে হেফাযত করেন এবং প্রকাশ্য ও গোপন সব ধরনের অশ্লীলতা থেকে পরিশুদ্ধ করেন।

আসুন আমরা রাব্বুল আলামীনের এ আয়াত সব সময় মেনে চলার চেষ্টা করি,

> *"আর অশ্লীল কাজের নিকটবর্তী হবে না, তা থেকে যা প্রকাশ পায় এবং যা গোপন থাকে।"*

পরিশুদ্ধি

মানুষ যখন হিদায়াত পায় তখন আগেকার গুনাহগুলো ছেড়ে আসে। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যে এবং তাঁর আনুগত্যের জন্যে আমরা এমন অনেক গুনাহ ছেড়ে দিই, যা করে আমরা অভ্যস্ত। এসব ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যাশা থাকে যে গুনাহ ছেড়ে আসার পর আমাদের হৃদয় প্রশান্তি পাবে। কিন্তু কখনো কখনো দেখা যায় গুনাহ ছেড়ে দেয়ার পর উল্টো মন দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে। আমরা তখন বিস্মিত হই। কেন এমন হয়, সেটা আমরা বুঝতে পাররি না।

আসলে এর পেছনে বেশ কিছু কারণ থাকতে পারে।

১। একটি সম্ভাব্য কারণ হলো, আমরা গুনাহটি ছেড়ে দিয়েছি, কিন্তু তাওবাহ করিনি। আমরা অতীতের করা গুনাহগুলোর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইনি। আমরা ধরেই নিয়েছি গুনাহ করা বন্ধ করে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমরা কি এভাবে সত্যিকার অর্থে আমাদের সন্তুষ্টি এবং অনুশোচনা প্রকাশ করতে পারছি?

আমরা যদি আসলেই আল্লাহর আনুগত্য করতে চাই, তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চাই, তাহলে গুনাহ ছাড়ার পাশাপাশি আমাদের ক্ষমাও চাইতে হবে। ইস্তিগফার চালিয়ে যেতে হবে। উদাসীনভাবে বা গা-ছাড়া-ভাবে ইস্তেগফার করলে সেই তাওবাহ কবুল নাও হতে পারে, এই ভয় বান্দার মনে থাকা জরুরি।

২। গুনাহ ছেড়ে আসার পর কষ্ট পাওয়া ইতিবাচকও হতে পারে।

হয়তো পরিশুদ্ধির জন্য আমাদের তাওবাহ আর ইস্তিগফার যথেষ্ট ছিল না। হয়তো আমাদের আমল, মনোযোগ, নিয়্যাত—কোনো-না-কোনো জায়গায় ত্রুটি রয়ে গিয়েছিল। আমাদের দিক থেকে যে কমতি ছিল সেটা আল্লাহ ﷻ পুষিয়ে দিচ্ছেন।

দুনিয়ার অল্প কিছু কষ্টের মাধ্যমে তিনি আমাদের পরিশুদ্ধ করে নিচ্ছেন আখিরাতের জন্যে।

নিঃসন্দেহে এটা মহান আল্লাহর রাহমাহ এবং নিয়ামত। এমন কত অপরাধী আছে যাদের তিনি পাপাচারের মধ্যেই ডুবে থাকতে দেন। প্রতিটি দিন তারা এগিয়ে যেতে থাকে জাহান্নামের দিকে। বিচারের দিনে আল্লাহর মুখোমুখি হবার আগে তারা সংশোধন কিংবা তাওবাহ করে না। কিন্তু আল্লাহ আমাদের এমন অবস্থার ওপর ছেড়ে দেননি। তিনি আমাদের তাওবাহ করার সুযোগ দিয়েছেন। আর আমাদের তাওবাহয় যে কমতি ছিল সেটা পরিশুদ্ধ করে নিচ্ছেন সামান্য কিছু কষ্টের মাধ্যমে।

সহিহ হাদিসে এসেছে, আবু বাকর ﷺ নবী ﷺ-কে নিচের আয়াতের ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন,

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ

যে মন্দকাজ করবে তাকে তার প্রতিফল দেয়া হবে...[তরজমা, সূরা আন-নিসা, ১২৩)]

এই আয়াতের পর পরিত্রাণের আর কী উপায় আছে? আমাদের প্রতিটি মন্দ কাজের জন্যই কি শাস্তি পেতে হবে? তখন নবী ﷺ বললেন-

غَفَر اللَّهُ لكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، ألستَ تَمْرَضُ؟ ألستَ تَنْصَبُ؟ أَلَسْتَ تَحْزَنُ؟ أَلَسْتَ تُصِيبُكَ اللَّأْوَاءُ؟

হে আবু বাকর, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। তুমি কি অসুস্থ হও না? তুমি কি ক্লান্ত হও না? তোমার দুঃখানুভূতি হয় না?

আবু বকর ﷺ বললেন, অবশ্যই ইয়া রাসূলাল্লাহ!

রাসূল ﷺ বললেন,

فهو ما تُجْزَوْنَ به

এসবের মাধ্যমেই তোমাদেরকে কৃত অপরাধের সাজা দেয়া হয়। [১৪]

সুতরাং গুনাহ ছেড়ে আসার পরের দুঃখ-কষ্ট, আল্লাহর পক্ষ থেকে পরিশুদ্ধি, যা দিয়ে তিনি বান্দাকে পবিত্র করে নেন, যাতে করে কিয়ামতের দিন আমরা তাঁর সামনে গুনাহমুক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারি।

[১৪] মুসনাদ আহমাদ, ৬৩৮; সহিহ ইবনু হিব্বান, ২৯২৬

তাই এই সাময়িক কষ্টের কারণে কখনো আল্লাহর আনুগত্য থেকে সরবেন না। আবার গুনাহের রাস্তায় ফিরে যাবেন না।

নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীল বান্দাদের ভালোবাসেন।

চোরাবালি

জীবন সুখদুঃখের পালাবদলের গল্প। জীবনে কখনো কখনো আমাদের কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়। কোনো-না-কোনো পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয় আমাদের সবাইকে। পরীক্ষা পার হয়ে যাবার পর হিসেবে মিলাতে গেলে দেখা যায় এসব সময়ে আল্লাহ ﷻ-এর হক্বগুলো আমরা আদায় করিনি। নাফরমানী করেছি। তখন আমাদের অনুশোচনা হয়। সত্যিকারের তাওবাহ এবং নেক আমলে বান্দাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এই অনুশোচনার অনুভূতি জরুরি।

তবে অনুশোচনার এ অনুভূতি হতে হবে সাময়িক। যেন আমরা ভুলগুলো শুধরে নিতে পারি। অনুশোচনার অনুভূতির পাশাপাশি অন্তরে এ আশাও থাকতে হবে যে আল্লাহ ﷻ আমাদের তাওবাহ কবুল করে নেবেন, আমাদের ভুলগুলো ক্ষমা করে দেবেন এবং আমাদের সুযোগ দেবেন পরিবর্তনের। আমরা আল্লাহর ব্যাপারে সুধারণা রাখব।

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্য রকম হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপার সুধারণা রাখা এবং আশাবাদী হবার বদলে অনেকে আটকা পড়ে যায় অনুশোচনা আর হতাশার চক্রে। বারবার ঘুরেফিরে রোমন্থন করে নিজের ভুলগুলো, দোষারোপ করে নিজেকে, ঘৃণা করে। অন্তর হয়ে পড়ে যন্ত্রনাগ্রস্ত, অসুস্থ, কলুষিত।

একসময় সে বিশ্বাস করতে শুরু করে এই পরীক্ষা আল্লাহর পক্ষ থেকে এক নির্মম শাস্তি। এর উদ্দেশ্য তাকে ধ্বংস করে দেয়া। সে মনে করতে শুরু করে যে আল্লাহ ﷻ তাকে ঘৃণা করেন এবং তার ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে এ শাস্তি চাপিয়ে দিয়েছেন। যেহেতু সে আগে অনেকবার সুযোগ পেয়ে, তাওবাহ করেও আবার গুনাহে ফেরত গেছে, তাই আল্লাহ ﷻ তাকে আর কোনো সুযোগ দেবেন না।

তারপর, ধীরে ধীরে তার অন্তরে শেকড় গাড়ে আল্লাহর প্রতি বিদ্বেষের অনুভূতি। সে বিশ্বাস করতে শুরু করে যে তার জন্য তাওবাহর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। তার

দুআর কোনো উত্তর আর আসবে না। দুনিয়াতে যতদিন আছে, এ হতভাগ্য, অভিশপ্ত অবস্থাতেই তাকে থাকতে হবে।

সাবধান! এটা শয়তানের সবচেয়ে ভয়ংকর চক্রান্তগুলোর একটি। সে প্রথমে মানুষকে বিশ্বাস করায় সংশোধনের উপায় হল ক্রমাগত নিজেকে দোষারোপ করে যাওয়া। কিন্তু এর মাধ্যমে সে আসলে মানুষকে আটকে ফেলে হতাশা, অনুশোচনা আর আত্মঘৃণার চক্রে। সে মানুষকে দিয়ে সীমালঙ্ঘন করায়, যা তাকে নিয়ে যায় বিপজ্জনক এক পথে। মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, আল্লাহর ফায়সালা নিষ্ঠুর। আর ঠিক সেই মুহূর্তে তার অন্তরে তৈরি হয় প্রচণ্ড ভয় আর হতাশা।

যখন কোনো দরজা, কোনো রাস্তা খোলা থাকে না, যখন যাবার কোনো জায়গা থাকে না, তখনো আল্লাহ ﷻ থাকেন। তাঁর দরজা সব সময় বান্দাদের জন্য খোলা। প্রশান্তি ও নিরাপত্তা পাওয়া যায় তাঁরই কাছে। তিনিই আশ্রয়হীনের আশ্রয়, দুর্বলের সহায়।

যতক্ষণ আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে বান্দা এই বিশ্বাস রাখে, ততক্ষণ সে তাওবাহর কথা চিন্তা করে।

কিন্তু শয়তান আল্লাহর রাহমাহর ব্যাপারে মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে হতাশা। সে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। তাকে বোঝায় যে এ পরীক্ষা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি। তাঁর ক্রোধ ও ঘৃণার ফল। শয়তান মানুষকে বোঝায় আল্লাহর রাহমাহর দরজা তার জন্য বন্ধ হয়ে গেছে।

অনুভূতিটা একটু বোঝার চেষ্টা করুন।

যদি আল্লাহর রাহমাহর দরজা আপনার জন্য বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে আপনি কোথায় যাবেন? কোথায় পালাবেন? কার কাছে যাবেন? কার কাছে আশ্রয় চাইবেন? কার কাছে সাহায্য চাইবেন?

নিঃসন্দেহে এক প্রচণ্ড ভয় তখন গ্রাস করবে আপনাকে।

আর শয়তান সেটাই চায়। সে নিজে ঠিক এ অবস্থাতেই আছে। আল্লাহর রাহমাহ থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। অন্য কেউ আল্লাহর রাহমাহ পাক, সেটা সে সহ্য করে পারে না। সে আপনাকেও তার কাতারে নামিয়ে আনতে চায়। কিন্তু শয়তানের ফাঁদে পা দেয়া যাবে না। তার চক্রান্তে বিভ্রান্ত হওয়া যাবে না।

মনে রাখবেন, শয়তান কিন্তু প্রথমেই আল্লাহর রাহমাহর ব্যাপারে আপনার মনে সন্দেহ তৈরি করবে না। সে বলবে না যে, আল্লাহ তো করুণাময় নন, ক্ষমাশীল নন।

সে জানে, এভাবে বলে লাভ নেই। এভাবে আগালে সে নিশ্চিত ব্যর্থ হবে। তাই সে আক্রমণ করবে অন্যদিক থেকে।

সে বলবে, হ্যাঁ, আল্লাহ পরম করুণাময়, ক্ষমাশীল। কিন্তু তুমি তাঁর করুণার উপযুক্ত না। তিনি বারবার তোমাকে সুযোগ দিয়েছেন তুমি বারবার নাফরমানী করেছ। আল্লাহ গাফুরুর রাহীম, কিন্তু তোমার এই ব্যর্থতা, তোমার এই পাপ এতই জঘন্য যে, তুমি আর তাঁর ক্ষমার যোগ্য না।

এসব বলে শয়তান আসলে কী চায়?

সে চায় আপনি হতাশার চোরাবালিতে আটকা পড়ুন। এমন হতাশা, যা আপনাকে পঙ্গু করে দেবে। শুষে নেবে নিজেকে সংশোধন করে রবের অভিমুখী হবার সব ইচ্ছে, সব শক্তি।

জানেন, ডিপ্রেশনের (বিষণ্নতা) ডাক্তারি সংজ্ঞা কী? এর উপসর্গগুলো কী?

গভীর বিষাদ, নিজেকে মূল্যহীন ভাবা, আত্মবিশ্বাসের অভাব, উৎসাহহীনতা, অপরাধবোধ, হতাশা, নেতিবাচক মনোভাব এবং নিজের কোনো ভবিষ্যৎ নেই, এমন ভাবা।

অর্থাৎ ডিপ্রেশন এমন এক অপরাধবোধ তৈরি করে, যা মানুষকে সংশোধনের দিকে চালিত করে না; বরং তাকে নিয়ে যায় আত্মঘৃণা, হতাশা আর নেতিবাচকতার চোরাবালিতে।

শয়তান মানুষকে আটকে ফেলে অপরাধবোধের ধাপে। সে মানুষকে বোঝায় যে তার অবস্থা সংশোধনের অযোগ্য। সে মানুষের অন্তর আর ইচ্ছাশক্তিকে পঙ্গু করে ফেলে। যেন মানুষ আল্লাহর আনুগত্য করার শক্তি না পায়, নিজেকে সংশোধনের চেষ্টা না করে এবং আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়।

শয়তান মানুষের মনে আল্লাহর ব্যাপারে ভুল ধারণা তৈরি করে—

'মালিক সব সময় তাঁর বান্দার গুনাহের অপেক্ষায় থাকেন। বান্দা গুনাহ করামাত্র তার ওপর শাস্তি চাপিয়ে দেন। আর সংশোধনের সব পথ বন্ধ করে দেন। ছিন্ন করে ফেলেন তার সাথে সব সম্পর্ক।'

শয়তান চায় রাব্বুল আলামীনের ব্যাপারে আমরা এমন ধারণা করি।

কিন্তু আমাদের রব কি এমন?

না! কক্ষনো না। তিনি মহিমান্বিত এবং এ মিথ্যাচার থেকে পবিত্র।

আমার আল্লাহর রাহমাহ, তাঁর ক্ষমাশীলতা এতই ব্যাপক যে, এর ব্যাপ্তি বুঝে ওঠাও আমাদের পক্ষে সম্ভব না। আর-রাহমানের দরজা সব সময় তাঁর বান্দাদের জন্যে খোলা।

মনে রাখবেন, শাস্তি পাবার পরও সন্তান যদি জানে যে পিতা তাকে ভালোবাসে, তাহলে সেও তার পিতাকে ভালোবাসবে। সে মনে করবে বাবা শাস্তি দিয়েছেন আমার ভালোর জন্যই। সন্তান যখন কোনো ভুল করে, বাবা তার কান টেনে ধরেন। আর সন্তান যখন টলটল চোখে মাটির দিকে তাকায়, বাবা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। কিন্তু সন্তান যদি মনে করে বাবা তাকে ঘৃণা করে তাহলে তার মন বিষিয়ে যাবে। আর মহান আল্লাহর রাহমাহ, তাঁর পবিত্র বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং বান্দার প্রতি তাঁর ভালোবাসার সাথে সৃষ্টির কোনো তুলনাই হয় না।

কাজেই শয়তান যখন আপনাকে কুমন্ত্রণা দেবে, 'তুমি আল্লাহর রাহমাহর যোগ্য না'।

তখন বলুন, হ্যাঁ, আমি আল্লাহর রাহমাহর উপযুক্ত না। কিন্তু তবুও তিনি আমার মতো বান্দাদের ওপর রহম করবেন, আমাদের ক্ষমা করবেন। কারণ, তিনি তাঁর বান্দাদের প্রাপ্য অনুযায়ী তাদের বিচার করেন না। তিনি আরও অনেক, অনেক বেশি উদার। তিনি বান্দাদের বিচার করেন তাঁর রাহমাহ অনুযায়ী।

যদি শয়তান বলে, 'আল্লাহ তোমাকে পরীক্ষায় ফেলেছেন, কারণ তিনি তোমাকে ঘৃণা করেন', তখন বলুন,

'না, বরং পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি আমাকে পরিশুদ্ধ করছেন।'

যদি শয়তান বলে, 'তোমার মতো জঘন্য বান্দা কীভাবে আল্লাহর রাহমাহ পাবে?'

তখন বলুন, আমার রবের রাহমাহ বিস্তৃত, আমার মতো বান্দাকে বঞ্চিত করার মতো সংকীর্ণ নয়।

কখনো শয়তানের এসব কুমন্ত্রণাকে অন্তরে শেকড় গাড়ার সুযোগ দেবেন না। কখনো মনে করবেন না কষ্ট, পরীক্ষা এগুলো শুধুই শাস্তি। আল্লাহর রাহমাহর ব্যাপারে হতাশ হবেন না। শয়তানকে সুযোগ দেবেন না আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্ক নষ্ট করার।

আল্লাহর করুণা থেকে নিরাশ হবেন না। হতাশ হবেন না। আমাদের রব আর-রাহমান, আর-রাহীম, আল-গাফফার। যখন সবাই আমাদের ছেড়ে যায় তখনো তিনি থাকেন। মাতৃগর্ভের অন্ধকার থেকে কবরের একাকিত্বে, সব অবস্থায় তিনি বান্দার নিকটবর্তী।

যখন সব দরজা বন্ধ, তখনো তাঁর দরজা খোলা। তিনিই আশ্রয়হীনের আশ্রয়, দুর্বলের সহায়। প্রশান্তি ও নিরাপত্তা পাওয়া যায় তাঁরই কাছে। তিনি আল্লাহ, তিনিই আমাদের রব।

মূলনীতি

ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে পরিপূর্ণভাবে পর্দা করার অনুরোধ করলেন। আর বললেন, বস্তাপচা সিরিয়াল দেখা বন্ধ করতে। চিন্তার বিষ ছড়ানো ছাড়া এগুলোর আর কোনো কাজ নেই। তারপর বেড়িয়ে গেলেন অফিসের জন্যে।

অফিসে থাকা অবস্থায় মেসেজ আসল। কোনো এক ওয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মেসেজ স্ত্রী তাকে ফরওয়ার্ড করেছেন। মেসেজের বিষয়বস্তু হলো, 'সহাবস্থান আর মানিয়ে চলা'। মেসেজের মূল বক্তব্য মোটামুটি এমন:

১। আপনি যা বিশ্বাস করেন তা মেনে নিতে আমি বাধ্য নই।

২। মানুষ একে অপরের সাথে পরিচিত হয় মিলেমিশে থাকার জন্যে। অন্যকে নিজের ইচ্ছেমতো বদলে নেয়ার জন্য না।

৩। আমি আপনার অবস্থান বোঝার চেষ্টা করব। কিন্তু তার মানে এই না যে আপনার অবস্থান আমি নিজের জন্যেও মেনে নেব।

৪। আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্য পরস্পরকে সঠিকভাবে বোঝানো। জোর করে কিছু চাপিয়ে দেয়া না।

৫। আমি যেমন সেভাবেই আমাকে মেনে নিন, যেন আপনি যেমন সেভাবে আপনাকেও আমি মেনে নিতে পারি...।

অথচ লোকটি তার স্ত্রীকে যে ব্যাপারে অনুরোধ করেছিলেন তা ইসলামের একটি ফরয বিধান। পর্দার বিধান হলো এমন একটি বিষয়, যা নিয়ে শরীয়াহতে কোনো দ্বিমত নেই। নিজের মনগড়া কিছু তিনি এখানে চাপিয়ে দেননি; বরং আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর আদেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহর বিধানের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে আজ এসব মুখস্থ বুলি শুনতে হয়।

এই মেসেজে যে 'সহাবস্থান আর মানিয়ে নেয়া'-এর কথা বলা হচ্ছে সেটা আসলে একধরনের সেক্যুলারিযম। যার উদ্দেশ্য ইসলামকে জীবন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া এবং দ্বীন পালনকে তুচ্ছ করা। এ ধরনের সেক্যুলারিযম আজ নানান রূপে আমাদের সামনে হাজির হয়।

হয়তো পর্দার কথা বলায় স্বামীকে এসব কথা শোনায় স্ত্রী।

অথবা, দ্বীনদার স্ত্রীর অনুরোধের জবাবে স্বামী এসব বুলি আওড়ায়।

কিংবা, বাবা-মায়ের সামনে এসব মুখস্থ কথার তুবড়ি ছোটায় সন্তান।

আজ অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, সেক্যুলারিযম আর আমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে হয় না। শাসকগোষ্ঠী, পশ্চিমা রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, কিংবা স্কুলের বিকৃত পাঠ্যসূচি আমাদের জোর করে সেক্যুলারিযম গেলাবে, সেই পর্যায় আমরা পার করে এসেছি অনেক আগেই। সেক্যুলারিযম এখন ঢুকে পড়েছে আমাদের ঘরে ঘরে। চার দেয়ালের ভেতরে বসে আমরা বানাচ্ছি সেক্যুলারিযমের বেদি। যে জায়গাটাতে কেউ এখনো আমাদের আল্লাহ ﷻ-এর আইনের বদলে মানুষের বানানো আইন মানতে বাধ্য করছে না, সেখানেও স্বেচ্ছায় আমরা আল্লাহ ﷻ-এর আইনকে ছেড়ে দিচ্ছি।

একজন প্রকৃত মুমিনের দায়িত্ব হলো ব্যক্তিগতভাবে এবং পরিবারের সবাইকে নিয়ে আল্লাহ ﷻ-কে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা। পরস্পরকে ন্যায় ও সত্যের দিকে এগিয়ে নেয়া, সেই পথে অবিচল থাকতে উদ্বুদ্ধ করা।

ওপরের পাঁচটি পয়েন্টের সাথে কুরআন ও সুন্নাহর এই ৫টি মূলনীতির তুলনা করে দেখুন :

১। وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু। তারা ভালো কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে... [সূরা আত-তাওবাহ, ৯ : ৭১]

২। إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

মুমিনদের যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এ মর্মে আহ্বান করা হয় যে, তিনি তাদের মধ্যে বিচার, মীমাংসা করবেন, তাদের কথা তো এই হয় যে, তখন তারা বলে : 'আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম', আর তারাই সফলকাম। [সূরা আন-নূর, ৫১]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ।৩

হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। [সূরা আত-তাহরিম, ৬]

ألا كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته ।৪

তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর প্রত্যেকেই তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।। [১৫]

.ما مِن عَبْدٍ اسْتَرْعاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً، فَلَمْ يَحُطْها بنَصِيحَةٍ، إلَّا لَمْ يَجِدْ رائِحَةَ الجَنَّةِ ।৫

যাকে আল্লাহ তা'আলা কোন দায়িত্ব দেয়ার পরও নিজ কর্তব্য সম্পর্কে উদাসীন থাকল, সে জান্নাতের ঘ্রাণ থেকেও বঞ্চিত হবে। [১৬]

একজন মু'মিন হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ওয়াহির আদর্শে নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করা। আমাদের মূলনীতি হবে কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতি। আমাদের আদর্শ হবে সালাফ আস-সালেহিনের আদর্শ। সময়ের সাথে সাথে বদলে যাওয়া, আর সস্তায় ফেরি হওয়া মুখরোচক বুলি আওড়ানো মুমিনের কাজ না।

রাষ্ট্র, সমাজ বেদখল হয়ে গেছে অনেক আগেই। পরিবার হলো আমাদের শেষ সম্বল। ঈমানের শেষ দুর্গ। বাতিলের সাথে সহাবস্থান করে এ দুর্গ হারানো যাবে না কিছুতেই।

আল্লাহর নিয়ামতের সাগরের সামনে মানুষের উদারতা মূল্যহীন। কেননা, আসমান ও যমীনের একচ্ছত্র অধিপতির ভান্ডারের সামনে বাকি সবকিছুই তুচ্ছ।

---

[১৫] সহিহ বুখারি, ৬৬৫৩
[১৬] সহিহ বুখারি, ৭১৫০

...কিন্তু ওরা যে আমাকে 'হুজুর' বলবে!

'আব্বু জানো, টিচার আজ আমাদের একটা গল্প বলেছেন। এক ইহুদী লোক নাকি নবী ﷺ-এর ঘরের সামনে ময়লা ফেলে রাখত।

'এ গল্পটা সত্য না, বাবা। বানানো গল্প। টিচার যখনই কোনো হাদিস বলবে, হাদিসটি কে বর্ণনা করেছেন, কোথায় আছে— সেটা জেনে নেবে।'

'আচ্ছা। টিচার আরও বলেছেন যে, বুধবার নখ কাটতে হয় না।'

'না বাবা, এটাও ভুল কথা। যখন টিচার বলবেন অমুক কাজটা হালাল কিংবা অমুক কাজটা হারাম তখন জানতে চাইবে, তার কথার পক্ষে কুরআন-সুন্নাহ থেকে কী কী দলিল আছে।'

'ঠিক আছে আব্বু। উম...আরেকজন টিচার সুদের কথা বলছিলেন। উনি বললেন, ব্যাংক থেকে সুদ নেয়া আসলে সাধারণ একটা ব্যাপার। এটা হলো ইন্ট্রেস্ট।'

'বাবা, তোমার তো তাকে প্রশ্ন করা উচিত ছিল, টিচার, আপনি যেটাকে ইন্ট্রেস্ট বলছেন, আল্লাহ ﷻ-এর দ্বীন অনুযায়ী সেটার হুকুম কী?'

কিন্তু আব্বু! আমি যদি এগুলো বলি তাহলে তো অন্য ছেলেরা তো আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। ওরা আমাকে 'হুজুর' বলবে।

'বাবা, শোনো। মনে করো তোমার স্কুলে একটা বুদ্ধির পরীক্ষা হলো। আইকিউ টেস্ট। পরীক্ষায় তুমি সবচেয়ে বেশি নম্বর পেলে। তখন অন্যরা তোমাকে নিয়ে হাসাহাসি শুরু করল। বলল, 'দেখ দেখ! 'স্মা-র্ট বয়!' তুমি কি তখন লজ্জা পাবে, নাকি নিজের বুদ্ধি নিয়ে গর্বিত হবে?'

'গর্বিত হব।'

'ওদের কথার কারণে তুমি কি ধরে নেবে যে তুমি ওদের চেয়ে খারাপ? নাকি ওদের সংকীর্ণ চিন্তা, আর অবুঝ কথাবার্তা শুনে ওদের নিয়ে তোমার দুঃখ হবে?'

'তা কেন ভাবব! আমাদের তখন ওদের নিয়ে দুঃখ হবে।'

'আর যদি ওরা তোমার সুন্দর চেহারা কিংবা ধনী হওয়া নিয়ে মজা করে? তাহলেও কি ব্যাপারটা একই রকম না?'

'হ্যাঁ, বাবা'

'কিন্তু বাবু দেখো, বুদ্ধি, সৌন্দর্য কিংবা টাকা, কোনোটাই গর্ব করার জিনিস না। এসবই আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া। তুমি এগুলো অর্জন করোনি। এগুলোর পেছনে তোমার কোনো কৃতিত্ব নেই। কোনো পরিশ্রম নেই। তাই না?

'হ্যাঁ।'

'যে জিনিসটা নিয়ে তোমার গর্বিত হওয়া উচিত, তা হলো ইসলাম। তুমি একজন মুসলিম, যে আল্লাহর একত্ব ও বড়ত্বের ঘোষণা দেয়। যে আল্লাহর বিধানগুলো মেনে চলে এবং অন্যদের সেগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এটা হলো তোমার গর্বের জায়গা। আর এ দ্বীনের ব্যাপারে কোনো কিছু যাচাই না করে গ্রহণ করা যাবে না। যেকোনো কিছু মেনে নেয়ার আগে আমাদের আগে নিশ্চিত হতে হবে ওই কথাটা আসলেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে এসেছে। কারণ, এই দ্বীন হলো আমাদের সবচেয়ে দামি সম্পদ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই দ্বীনের ব্যাপারে কোনো তথ্য হেলাফেলায় গ্রহণ করা যাবে না।

এটাই কি গর্বিত হবার কারণ হওয়া উচিত না?'

'হুমম...'

'তাহলে যখন অন্যরা বলবে—তুই কি হুজুর হয়ে গেলি?

তখন তাদের বলবে, আমি একজন সাধারণ মানুষ। তবে আমার জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে। আমি জানি যে আল্লাহ ﷻ আমাকে এমনি এমনি এ দুনিয়াতে পাঠাননি। আমি জানি আমাকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। আর আমার তাঁকে সন্তুষ্ট করতে হবে। তা না হলে এ জীবন অর্থহীন। আর এটাই মুসলিম হবার অর্থ। আমি মুসলিম।

তোমরা কি মুসলিম না?

বাবা, মানুষের কথায় প্রভাবিত হওয়া যাবে না। বিশেষ করে, ওরা যখন এমন বিষয়

নিয়ে হাসে যেটা আমাদের গর্বের উৎস। আমাদের বরং ওদের জন্য আফসোস করা উচিত এবং আমাদের ওদের বোঝানোর চেষ্টা করা উচিত যে ইসলামই আমাদের মূল পরিচয়, আর আমরা এ পরিচয় নিয়ে গর্বিত। ঠিক যেভাবে আল্লাহ ﷻ আমাদের শিখিয়েছেন।'

প্রিয় পাঠক, আপনার সন্তানকে ইসলামকে নিয়ে গর্বিত হতে শেখান।

উম্মাহর শেষ দুর্গ

নারী ও পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পুরুষকে এমন কিছু ঘাটতিসহ তৈরি করেছেন যেগুলো নারীর সংস্পর্শ ছাড়া পরিপূর্ণতা পায় না। একই কথা প্রযোজ্য নারীদের ক্ষেত্রেও। নারীদের মাঝে এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের অভাব আছে, যা কেবল পুরুষের মাধ্যমেই পূর্ণ হতে পারে। এ কারণে পরিবার ও সমাজে তাদের ভূমিকা আলাদা। নারী ও পুরুষের সম্পর্ক তাই সহযোগিতা ও বোঝাপড়ার। প্রতিযোগিতার না। আমাদের শরীরে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস একই সাথে কাজ করে। তাদের ভূমিকা আলাদা, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য এক। নারী ও পুরুষের ব্যাপারটাও এমন।

নারী ও পুরুষের দায়িত্ব ও অধিকার ইসলামে এমনভাবে ঠিক করা হয়েছে, যাতে তারা পাশাপাশি থেকে কাজ করতে পারে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে। একটি সুস্থ, সুখী ও প্রাণবন্ত পরিবারের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার এ সম্পর্ক থাকাটা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে সন্তানদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রে। একটি পরিবারকে সঠিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে স্বামী ও স্ত্রী, দুজনকেই সুষ্ঠুভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে। শিশুর সঠিক বিকাশের জন্যে বাবা-মা দুজনের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। পিতার ছায়া যেমন প্রয়োজনে তেমনি প্রয়োজন মা-র মমতাময় স্পর্শ। দুটোই সন্তানের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু আজ আমরা এ ভূমিকাগুলো উপেক্ষা করছি।

অনেক বিবাহিত দম্পতি সন্তানদের ঘরের অলংকার বা শোপিস-জাতীয় কিছু একটা মনে করেন। তারা সন্তান জন্ম দেন কারণ,

> 'সবারই তো বাচ্চা থাকে' অথবা,
>
> 'সন্তান তো থাকতেই হয় এটাই তো সমাজের রীতি...।'

তাদের কাছে সন্তান থাকাটা 'পরিপূর্ণ মানুষ' কিংবা 'সুখী দম্পতি' হওয়ার প্রমাণ। এর বেশি কিছু না!

এভাবে চিন্তা করার কারণে সন্তান জন্ম দেয়ার পেছনে গভীর কোনো উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য তাদের থাকে না। এই সন্তানদের নিয়ে তারা জান্নাতে ঢোকার স্বপ্নে দেখে না। নিজের সন্তানদের দিয়ে উম্মাতে মুহাম্মাদীর নেককার বান্দার সংখ্যা তারা বাড়াতে চায় না।[১৭] দ্বীন ইসলামের ওপর সন্তানকে বড় করার আগ্রহ-উদ্দীপনা তাদের মাঝে নেই।

একসময় তাদের কাছে সন্তানদের বোঝা মনে হয়। মনে হয় সন্তানেরা তাদের আটকে ফেলেছে। বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে ব্যক্তিগত আনন্দ, ক্যারিয়ারের উন্নতি, আর জীবনের অগ্রগতির পথে। সন্তানদের তারা দেখতে শুরু করে সুখ-শান্তি, শখ-আহ্লাদের পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে। এ ধরনের অভিভাবকেরা প্রায় নিশ্চিতভাবেই একসময় না একসময় সন্তানদের সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে।

তারা ভাবেন, সন্তানদের পেছনে সময় দিয়ে তারা তাদের করুণা করছেন। তাদের মধ্যে বিরক্তি কাজ করে। কারণ সন্তানের পেছনে সময় দিতে গিয়ে নিজের স্বপ্নের পেছনে যথেষ্ট সময় দেয়া যাচ্ছে না। নিজের ক্যারিয়ার আর সোশ্যাল লাইফে বাকিদের সাথে মানিয়ে চলা যাচ্ছে না। যা যা করার ইচ্ছে ছিল, তার অনেক কিছুই করা যাচ্ছে না। অনেক প্ল্যান ছিল, সব ভেস্তে যাচ্ছে। কারণ, এ সন্তানেরা কখনো সেই প্ল্যানের অংশই ছিল না।

বাবা-মা তখন সন্তানদের অবহেলা করতে শুরু করেন। বুকের মাঝখানে তৈরি হওয়া সেই শূন্যতা পূরণের জন্য বাচ্চারা ঝুঁকে পড়ে টিভি, মিডিয়া আর ইন্টারনেটের দিকে। তাদের চিন্তাচেতনা, আদর্শ ও আচরণ ঠিক করে দেয় মিডিয়া। তারা হয় আদর্শিক আগ্রাসনের সহজ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিকার।

আসলে অভিভাবক হওয়ার অর্থ নিয়ে এ ধরনের মানুষের চিন্তাভাবনায় বড় ধরনের পরিবর্তন আনা দরকার। নবীজি ﷺ সন্তানদের প্রতি মনোযোগ দিতে বলেছেন এবং বলেছেন তাদের জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম হিসেবে গড়ে নিতে।

যেমন হাদিসে এসেছে,

إِذا ماتَ الإنْسانُ انْقَطَعَ عنه عَمَلُهُ إلَّا مِن ثَلاثَةٍ: إلَّا مِن صَدَقَةٍ جارِيَةٍ، أوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أوْ وَلَدٍ صالِحٍ يَدْعُو له

যখন একজন মানুষ মারা যায় তাঁর সমস্ত নেক আমলের দুয়ার বন্ধ হয়ে যায়।

---

[১৭] 'তোমরা অধিক সন্তানের প্রসবনী ও স্বামীদের অধিক ভালোবাসে এ ধরনের মেয়েদের বিবাহ কর, কারণ, (কিয়ামতের দিন) অন্যান্য উম্মাহর ওপর তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে আমি গর্ব করবো।'সুনান আবু দাউদ, ২০৫০

কেবল সাদকায়ে জারিয়া, উপকারী ইলম ও নেককার সন্তানের দু'আ তাঁর কাছে পৌঁছায়।[১৮]

আরেকটি হাদিসে এসেছে,

مَنْ كان له ثلاثُ بناتٍ، فصبرَ عليْهِنَّ، وأطعَمَهُنَّ، وسقاهُنَّ، وكساهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ، كُنَّ لَهُ حجابًا مِنَ النارِ يومَ القيامَةِ

যে ব্যক্তির তিনটি কন্যা আছে এবং সে তাদের ধৈর্যধারণ করে লালনপালন করে, নিজ সম্পদ থেকে খাওয়ায়-পরায়, কিয়ামতের দিন সেই কন্যারা তাদের বাবা-মায়ের জন্যে ঢাল হিসেবে কাজ করবে এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে।[১৯]

হাদিসগুলো আমাদের মন-মননে ভালোভাবে গেঁথে নেয়া দরকার।

সন্তান হলো বাবা-মার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্ট। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আপনি আসলে কেমন মানুষ, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ আপনার সন্তান। এবং তারাই হলো মৃত্যুর পর আপনার জন্য সাদাকায়ে জারিয়াহ। যখন আপনি থাকবেন না, তখন একজন নেক সন্তানই আপনার নেক আমলের খাতা চালু রাখবে।

সন্তানদের অবহেলা করে অন্য কিছুতে মনোযোগী হবার অবধারিত ফলাফল হলো তারা নিজেরা ধ্বংস হবে এবং পরিবার ও উম্মাহর ধ্বংসের উপকরণে পরিণত হবে। এর অসংখ্য উদাহরণ আজ আমাদের সামনে আছে।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

বলো, যারা নিজেদের আর নিজেদের পরিবার-পরিজনকে কিয়ামতের দিনে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। জেনে রেখো, এটাই হলো স্পষ্ট ক্ষতি। [তরজমা, সূরা আয-যুমার, ১৫]

পরিবার আজ উম্মাহর শেষ দুর্গ। আমাদের শত্রুরাও এটা জানে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল, রাষ্ট্র, সমাজ—সব জায়গা থেকে ইসলামকে অনেকাংশে সরিয়ে ফেলতে সফল হয়েছে তারা। কিন্তু আমরা এখনো নিজ ঘরের চার দেয়ালের ভেতরে পরিবারকে

---

[১৮] সহিহ মুসলিম, ১৬৩১
[১৯] সুনান ইবনু মাজাহ, ৩৬৬৯

রক্ষা করতে এবং পারিবারিক বন্ধনগুলো দৃঢ় রাখতে সক্ষম। তাই তারা সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, এ দুর্গ ভেঙে ফেলার। যদি এ দুর্গ টিকে থাকে তাহলে একদিন শত্রুর সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়ে হয়তো এর ভেতর থেকেই জেগে উঠবে উম্মাহর পুনর্জাগরণের মহিরুহ।

কিন্তু তার জন্য মেনে চলতে হবে আল্লাহর নির্ধারিত সীমাগুলো। নিজের পরিবারের হকের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করতে হবে। তা না হলে শত্রুর চক্রান্তের চেয়ে আমাদের অবহেলাই আরও বড় বিপর্যয় ডেকে আনবে।

সন্তানদের অবহেলা করবেন না। তাদের উপেক্ষা করবেন না। তারা বয়সে বড় হচ্ছে। তাদের শরীরগুলো বেড়ে উঠছে। কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে বাড়ছে দুর্বলতা। তারা ভালো খাওয়া-দাওয়া করছে, কিন্তু তাদের হৃদয়গুলো ভালোবাসা, স্নেহ আর প্রশান্তির জন্য পিপাসার্ত।

মনে রাখবেন, সময় এখন আর আগের মতো নেই।

যে মুহূর্তে আপনি ওর দিক থেকে চোখ সরাবেন ঠিক তখনই শত শত বাজে চিন্তা হাজির হবে। এটা ওদের দোষ না। আমাদের সমাজটাই যে আজ এমন হয়ে গেছে। মুহূর্তের মধ্যে ওর চোখের সামনে হাজির হবে হাজার হাজার নোংরা ভিডিও। বিনোদন, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, মজা আর ট্রেন্ডের নামে অশ্লীলতা আর অনৈতিকতার পসরা সাজিয়ে আনা হবে তার সামনে। সবটুকু ঈমান লুট করে, নিয়ে যাওয়া হবে দ্বীন ইসলাম থেকে অনেক দূরে। বুঁদ করে রাখা হবে নিজের নফস আর খেয়ালখুশিতে।

একবার চিন্তা করুন, কীভাবে এমন অবস্থায় মাসের পর মাস বাবা-মায়ের উপদেশ ও দিকনির্দেশনা ছাড়া সন্তান ঠিক থাকবে? আপনি যদি ওকে খারাপ থেকে দূরে থাকার জন্য প্রস্তুত না করেন, তাহলে ও কীভাবে এর মোকাবিলা করবে? আপনি যদি ওকে ভালোটা নাও শেখান খারাপটা কিন্তু ও নিশ্চিতভাবে শিখে যাবে। স্কুল, টিভি, ইন্টারনেট, গান, সিনেমা, সমাজ, সংস্কৃতি আপনার নিষ্পাপ বাচ্চাটাকে নিষ্পাপ থাকতে দেবে না। কলুষিত করে ফেলবে ওর চিন্তাকে।

সন্তানকে যদি ঈমান, আকিদাহ, আল্লাহর ভালোবাসা এবং তাক্বওয়ার শিক্ষা না দেন, তাহলে আপনার দেয়া নতুন পোশাক, হাতখরচের টাকা কিংবা রেখে যাওয়া সম্পদ ওদের কোনো কাজে লাগবে না। একদিন ঠিকই আল্লাহর সামনে ওরা আপনাকে দোষারোপ করবে। সন্তানের ভালো দিকগুলো খুঁজে বের করে চর্চার দ্বারা সেগুলোকে আরও গড়ে তোলা আপনার দায়িত্ব। তাদের স্বভাবের খারাপ দিকগুলো চিহ্নিত করে ধীরে ধীরে সেগুলো দূর করাও আপনার দায়িত্ব। আপনার সন্তানকে পবিত্র রাখার

দায়িত্ব আপনারই।

হে অভিভাবকেরা শুনুন, ব্যস্ততার অজুহাত দেবেন না। এ অজুহাত আসলে নিজের সাথে প্রতারণা ছাড়া কিছুই না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী ﷺ-গণ শুধু নিজ চাকরি, ব্যবসা কিংবা পরিবার নিয়ে চিন্তা করতেন না। তাদের চিন্তা করতে হতো পুরো পৃথিবী, পুরো মানবজাতির কাছে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেয়া নিয়ে। কিন্তু তাঁরা ﷺ এটাকে কখনো অজুহাত হিসেবে দাঁড় করাননি। বিশ্বজয়ের অভিযান থেকে ফিরে তাঁরা ﷺ সন্তানদের সময় দিতেন। তাদের শিক্ষা দিতেন তাওহিদ এবং ওয়া আল ওয়ালা ওয়াল বারা-এর, কুরআন ও সুন্নাহর। দ্বীনি ইলম ও তাযকিয়্যাতুন নাফসের। দ্বীন ইসলামের বুঝ ও আদর্শের ওপর সন্তানদের গড়ে তুলতেন তাঁরা j।

তাই অজুহাত দেবেন না। সন্তানদের চাহিদা মেটানোর জন্য আপনি রোজগারে ব্যস্ত, এ কথা বলবেন না। সন্তানদের প্রথম চাহিদা হলো আপনার সঙ্গ, আপনার কাছ থেকে দ্বীনের শিক্ষা পাওয়া। এটা আপনার ওপর ওদের অধিকার। ভালো খাওয়া-দাওয়া করে নাদুসনুদুস হওয়া শরীরের মধ্যে মুমূর্ষু ঈমান নিয়ে গড়ে ওঠা প্রজন্মের কোনো প্রয়োজন উম্মাহর নেই।

এখন দুঃসময় চলছে। বড় হবার সময় আমাদের এত ফিতনা আর প্রলোভনের মুখোমুখি হতে হয়নি। আমরা যতটা সময়, আদর-ভালোবাসা পেয়ে বড় হয়েছি, তার তুলনায় আরও অনেক বেশি যত্নের প্রয়োজন আমাদের অসহায় সন্তানদের।

ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে হাতের ফোনটা দূরে সরিয়ে রাখুন। নিজের কলিজার টুকরোগুলোকে সময় দেয়ার জন্য দুনিয়াকে এক পাশে সরিয়ে রাখুন। কারণ, দ্বীনদার সন্তানের অন্তরের গভীর থেকে আসা দু'আ বাবা-মায়ের জন্য অনেক দামি। আজ যেসব তুচ্ছ জিনিসের জন্য সন্তানকে সময় দিচ্ছেন না, তার সবগুলোর চেয়ে আপনার সন্তানদের এই দু'আ আপনার জন্য বেশি দামি,

'হে আল্লাহ, আমার পিতামাতাকে আপনি ক্ষমা করে দিন।'

তাই ঘরে ফিরে যান। সন্তানদের মুড়িয়ে রাখুন ভালোবাসা, স্নেহ-মমতার চাদরে। ওদের প্রতি মনোযোগ দিন। শান্ত হয়ে বসে শুনুন ওদের হাবিজাবি কথা। ওদের সাথে খেলুন, গল্প বলুন, ওদের মধ্যে গড়ে তুলুন ঈমান আর ইসলামী মূল্যবোধ। উম্মাহর শেষ দুর্গটা যেন অবহেলায় হাতছাড়া হয়ে না যায়।

বংশগতি

আদরের মেয়ে বড় হয়ে গেছে। সেই দিনের ছোট্ট মেয়েটা এখন মুকাল্লাফাহ্ বা বালেগা হয়ে গেছে[২০]। দ্বীনের আদেশ-নিষেধগুলো মেনে চলা এখন ওর ওপর ফরয। কিন্তু এক বছর গেল, দুই বছর গেল, মেয়ে পর্দা করছে না।

আপনি কেন মেয়ের সাথে এখনো এ নিয়ে কথা বলছেন না?

'ওর পর্দা করার নিয়্যাত আছে, আমি জানি। তবে আমি এখনই ওকে জোর করতে চাই না।'

আপনি জোর করতে চান না?!

আচ্ছা, যখন ওকে টীকা দেয়ার সময় হয়েছিল তখনো কি একই কথা বলেছিলেন? এইভাবে চিন্তা করেছিলেন? নাকি তখন 'জোর' করেছিলেন? বসন্ত, চিকেনপক্স, পোলিও, এগুলো কি জাহান্নামের আগুনের চেয়েও ভয়ংকর? মেয়েকে টীকা দেয়া আপনার দায়িত্ব, কিন্তু জাহান্নামের আগুন থেকে তাঁকে বাঁচানো আপনার দায়িত্ব না? মহান আল্লাহ ﷻ কি বলেননি,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে বাঁচাও, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর...। [তরজমা, সূরা আত-তাহরীম, ৬]

দাউদাউ করে জ্বলতে থাকা কোনো ঘরের দিকে মেয়েকে এগিয়ে যেতে দেখলে আপনি কি তাকে থামাবেন না? নাকি তখনো বলবেন,

---

[২০] যে বয়সে মানুষের ওপর শরীয়াহর বিধান কার্যকর হয়

'আমি ওকে জোর করতে চাই না?'

অথচ জাহান্নামের আগুনের তুলনায় এই পৃথিবীর আগুন তো কিছুই না।

মনে করুন, আপনার আদরের মেয়েটার ভয়ংকর কোনো অসুখ হয়েছে। আপনি ওর কাছ-ছাড়া হলেই অসুখ বেড়ে যায়। এমন অবস্থায় আপনি কি ওকে চোখের আড়াল করবেন? আপনি কি দু-এক বছরের জন্য ওর কাছ থেকে দূরে চলে যাবেন, যাতে ও 'নিজে নিজে সুস্থ হতে শেখে'?

তাহলে পর্দার ক্ষেত্রে কেন ও 'নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নেয়া'র জন্য অপেক্ষা করছেন?

নাকি আপনি মনে করেন, আজ যেসব গুনাহ সে কামাচ্ছে আল্লাহর, সামনে সেগুলোর হিসেবে দেয়ার চেয়ে দুনিয়ার সামান্য অসুখবিসুখ বেশি গুরুতর?

আসলে বাস্তবতা কী জানেন?

আল্লাহর হুকুমকে আপনি ছোট করে দেখেছেন, তাই আপনার সন্তানও ছোট করেই দেখবে। আল্লাহর আদেশ ও বিধানের তেমন কোনো গুরুত্ব আপনার কাছে নেই। তাই আপনার মেয়েও গুরুত্ব দিচ্ছে না। মা-বাবা যদি ছোটবেলা থেকেই সঠিকভাবে লজ্জাবোধ ও শালীনতার এর শিক্ষা দিতো, মেয়েকে আল্লাহর আনুগত্য করা শেখাতো, ইসলামের বুঝের ওপর ওকে বড় করতো, তাহলে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সে নিজে থেকেই পর্দার ব্যাপারে সচেতন হতো। কিন্তু তা করা হয়নি।

তাই না?

নিজের বুকে হাত রেখে বলুন তো, কথাটা ঠিক না বেঠিক?

ঠিক আছে, এগুলো তো অনেক আগের কথা। এখন আর এসব বলে লাভ নেই। কিন্তু যখন সে বয়ঃসন্ধিতে পদার্পণ করছিল তখন কী করেছিলেন? তখন কি ওকে কাছে ডেকে বলেছিলেন,

> 'মা, তুমি তো বড় হয়ে গেছ, মাশাআল্লাহ। আল্লাহর ইচ্ছায় তুমি এখন একজন নারী হতে যাচ্ছ। চলো তোমার জন্য কিছু বোরকা কিনে আনি। আল্লাহ তোমাকে পর্দা করতে বলেছেন। এ পর্দা তোমাকে করবে সম্মানিত ও নিরাপদ।'

আল্লাহর অনুগত বান্দার মতো একবার যদি কথাগুলো ওকে বলতেন! সে যদি আপনাকে আল্লাহর আনুগত্য করতে দেখত, তাঁর ﷻ মহত্ত্বের ঘোষণা দিতে দেখত! সে যদি আপনাকে দেখত আল্লাহর বিধিবিধানগুলো আন্তরিকভাবে আঁকড়ে ধরতে,

তাহলে এই অনুভূতি, এই মনোভাব তার মাথায়ও গেঁথে যেত।

কিন্তু আপনি যদি আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে লজ্জিত হন, আমতা আমতা করে কথা বলেন, যদি আপনার কথায় ঈমানের শক্তি ও নিশ্চিত বিশ্বাসের ছাপ না থাকে, তাহলে ওর অবস্থাও হবে নড়বড়ে। ও ধরে নেবে, এটা হয়তো ঐচ্ছিক কোনো ব্যাপার। যা ইচ্ছে হলে মানা যায়, ইচ্ছে হলে ছাড়া যায়।

আপনি যদি ওকে বলেন, 'আমি চাই তুমি নিজ থেকে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নাও। আমি তোমার ওপর জোর করতে চাই না', তাহলে সেটা হবে সরাসরি আল্লাহর কালামের সাথে সাংঘর্ষিক। এর মাধ্যমে আপনি আল্লাহর হুকুমকে অবজ্ঞা আর তাচ্ছিল্য করছেন। আর এ মনোভাব সংক্রমিত হচ্ছে আপনার মেয়ের মনেও।

আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজেদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে। [তরজমা, সূরা আল-আহযাব, ৩৬]

আমি আল্লাহ ﷻ-এর কাছে দু'আ করি, এ কথাগুলো যেন প্রতিটি মমতাময় পিতা-মাতার কাছে গিয়ে পৌঁছায়, যাতে করে যে ভুল হয়ে গেছে সেটা তারা শুধরে নিতে পারেন।

হে পিতা!

হে পিতা, আপনি পরিবারের কর্তা। শুরু করেছিলেন স্ত্রীকে নিয়ে। ছোট্ট ঘরে দুজনের সুখদুঃখের সংসার। তারপর ঘর আলো করে আসল বাচ্চারা। আপনার পরিবার বড় হলো। দিন গেল, মাস গেল, গেল বছর। আপনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন নিজের কাজে। পরিবারের জন্য সময় নেই। এখন সপ্তাহে কিংবা মাসে একবার সন্তানদের জন্য সময় বের করতেও হিমশিম খেতে হয়। পরিবারের হক আদায়ের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে গেলেন আপনি। আর স্ত্রীকে অজুহাত দিলেন,

'তোমাদের জন্যই তো সকাল-সন্ধ্যা হাড়ভাঙা খাটুনি করছি। সময়টা কঠিন। দিন দিন খরচ বাড়ছে। আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করছি। আর কী চাও?'

অথবা, চাকরি কিংবা ব্যবসা নিয়ে না; আপনি হয়তো 'দাওয়াহ নিয়ে ব্যস্ত'। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো নিজের পরিবারের জন্য দাওয়াহ করার সময় আপনার হয় না। আপনার দাওয়াহ থেকে আপনার পরিবার উপকৃত হয় না। বরং 'দাওয়াহ'এর অজুহাতে আপনি তাদের উপেক্ষা করেন।

স্ত্রী যখন প্রতিবাদ করে, তখন শীতল গলায় তাঁকে শুনিয়ে দেন :

'উম্মাহর বিপর্যয়ের সমাধান করা, দাওয়াহর জন্য সময় দেয়া নিজের পরিবারের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

হ্যাঁ, আপনার কথা ঠিক। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের চেয়ে উম্মাহর স্বার্থ এবং ইসলামের লড়াই অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এটাও সত্য যে, চাকরি কিংবা দাওয়াহ, দু' জায়গাতেই আপনি নিস্বার্থভাবে কাজ করছেন না। আপনি এগুলোর মাঝে আত্মতৃপ্তিও খুঁজছেন। কাজ, দাওয়াহ, সামাজিক সম্পর্ক ইত্যাদি দিয়ে একান্ত 'সাফল্যের গল্প' লেখার চেষ্টা করছেন আপনি। কিন্তু নিজের পরিবারে, নিজের সন্তানদের কাছে এই আত্মতৃপ্তির খোঁজ আপনি করছেন না। পরিবারের হক আদায়ের

চেয়ে নিজের পেছনে সময় দেয়া আপনি বেশি উপভোগ করেন। আপনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন নিজের অন্তরের খোরাক। ছুটে চলেছেন তৃপ্তি আর সন্তুষ্টির পেছনে। পরিবারকে দেয়ার মতো সময় আপনার নেই। কিন্তু অফিসে কিংবা ঘরের বাইরের পরিচিত মানুষদের ঠিকই প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সময় দিচ্ছেন।

নিজেকে আর আশেপাশের মানুষকে বুঝিয়ে যাচ্ছেন, বাধ্য হয়ে আপনি এমনটা করছেন। কাজের চাপে, পরিবারের প্রয়োজন পূরণে আপনাকে সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হয়। সন্তানদের সময় দেয়া, তাদের লালন-পালন করা কেবল আপনার স্ত্রীর দায়িত্ব।

কিন্তু একসময়, সন্তানদের প্রতি এই অবহেলার মনোভাব আপনার স্ত্রীর মাঝেও সংক্রমিত হবে। আপনার মতো তার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুও দখল করে নেবে 'সেলফ ফুলফিলমেন্ট'-এর মোহ। বাচ্চাদের দিক থেকে মনোযোগ সরিয়ে তিনি মনোযোগ দেবেন সোশ্যাল মিডিয়া, সামাজিক অনুষ্ঠান কিংবা ক্যারিয়ারের দিকে। ওরা উপেক্ষিত হবে। আপনাদের 'সাফল্যের গল্প'-এর বলি হবে বাচ্চারা।

আপনারা যে সন্তানদের ভালোবেসে বড় করার বদলে বোঝা মনে করছেন সেটা ওদের চোখ এড়াবে না। ওরা বুঝবে আপনারা ওদের সাথে সময় কাটানো উপভোগ করেন না। ওরা আপনাদের বিরক্তির কারণ। তখন ওরা নিজেরাই দূরে সরে যাবে। নিজ সন্তানের মাঝে যেসব বাবা-মায়েরা আনন্দ খুঁজে পান না, তাদের বাচ্চাগুলোর শৈশব কাটে খুব কষ্টে। ঘর থেকে পাওয়া অবহেলা ওদের একই সাথে ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ আর ব্যথিত করে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে ওরা জড়িয়ে পড়ে নানান সমস্যায়। সেই সাথে অবনতি হতে থাকে সন্তান আর বাবা-মায়ের মধ্যকার সম্পর্কের।

আপনার চোখের শীতলতা হবার বদলে ওরা তখন আপনার দুঃশ্চিন্তার কারণ হবে। তখন একে অপরকে দোষ দেবেন আপনারা। অন্যজনের ওপর দায় চাপিয়ে নিজে নিষ্কৃতি পেতে চাইবেন। তারপর একদিন হয়তো আপনারা পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝতে পারবেন। 'জরুরি অবস্থা' ঘোষণা করবেন বাসায়। অন্যান্য কাজের বোঝা কমিয়ে চেষ্টা করবেন বাচ্চাদের পেছনে আরও সময় ও শ্রম দেয়ার।

কিন্তু ব্যথিত বিস্ময়ে সেদিন আবিষ্কার করবেন সন্তান একবার মায়ের কাছ থেকে দূরে সরে গেলে তাকে ফিরিয়ে আনা কঠিন। অনেক কঠিন। পৃথিবীর সব ভুল শোধরানো যায় না। কম্পিউটার প্রোগামের মতো জীবনে 'আন-ডু' অপশান থাকে না, যে ক্লিক করলেই সব আগের মতো হয়ে যাবে। হয়তো আপনি একসময় ক্ষমা পাবেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশ উপেক্ষা করার মাশুল আপনাকে দিতে হবে সারা জীবন।

আপনি নিশ্চয়ই রাসূল ﷺ-এর চেয়ে বেশি ব্যস্ত নন। আপনি নিশ্চয় তাঁর চেয়ে বেশি

দাওয়াহ করছেন না, তাই না?

জানেন তিনি ﷺ কী বলছিলেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إن لربّكَ عليك حقًّا، ولنفسِك عليك حقًّا، ولأهلِك عليك حقًّا، فأَعْطِ كلَّ ذِي حقٍّ حقَّه

তোমার ওপর তোমার রবের অধিকার আছে, তোমার রূহের তোমার ওপর অধিকার আছে এবং তোমার পরিবারেরও তোমার ওপর অধিকার আছে। অতএব, প্রত্যেককে তাদের নিজ নিজ অধিকার বুঝিয়ে দাও। [২১]

কাজেই প্রত্যেকের অধিকার আদায় করতে হবে। আপনি পরিবারের কর্তা। পরিবারের দায়িত্ব আপনার ওপর। আর এ দায়িত্বের অংশ হলো স্ত্রীর জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। সবকিছুর জন্য তাকে দোষারোপ করা না।

যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন আন্তরিকভাবে চেষ্টা করুন ভুলগুলো শুধরে নেয়ার। কখনো বলবেন না, "ইস্! আমি যদি অমুক অমুক কাজগুলো করতাম...।"

বরং বলুন,

قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ

ক্বাদারুল্লাহি ওয়া মাশাআ ফা'আল

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ

...কোনো (অবাঞ্ছিত) বিষয়ে আক্রান্ত হলে বলো না- যদি আমি এই করতাম তাহলে এই এই হত; বরং বলবে, আল্লাহর ফয়সালা; তিনি যা চান তা-ই করেন... [২২]

আল্লাহ ﷻ-এর কাছে সাহায্য চান যাতে করে নিজের ঘরকে আবার গড়ে তুলতে পারেন এবং সকলের হক আদায় করতে পারেন।

---

[২১] সহিহ বুখারি, ৬১৩৯
[২২] সহিহ মুসলিম, ২৬৬৪

প্রিয় সারার জন্যে...

আমার মেয়ের ক্যান্সার ছিল[২৩]। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ ﷻ-এর সিদ্ধান্ত নিয়ে ও কখনো অসন্তুষ্ট ছিল না। কালকেও আমাকে বলছিল—'বাবা, আমাকে কুরআনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে শোনাও। জান্নাতের বর্ণনা এর পুরস্কারের আয়াতগুলো পড়ো।'

আলহামদুলিল্লাহ।

ক্যান্সার ওর ফুসফুসে ছড়িয়ে পড়েছিল। মাঝেমাঝে খুব শ্বাসকষ্ট হতো। কয়েক দিন আগে খুব বেশি কষ্ট হচ্ছিল। নিশ্বাস নিতে পারছিল না। এমন অবস্থাতেও আমার মেয়ে বলছিল,

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ইয়া আল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ'

আল্লাহর কসম! আমি ওর ব্যাপারে মহান আল্লাহর কাছ থেকে ভালো ছাড়া আর কিছু আশা করি না। আল্লাহ ﷻ ওকে সম্মানিত করবেন ইন শা আল্লাহ। বিশেষ করে ওর বয়স যেহেতু খুব অল্প ছিল। ও ছিল একটা শিশু, যার হিসেবের খাতা এখনো খোলেনি। আল্লাহর কসম! আমার দৃঢ় বিশ্বাস আল্লাহ ﷻ ওকে সম্মানিত করবেন।

আমার আর আমার পরিবারের জন্য কাজটা এখন খুব সহজ। আমাদের এখন শুধু নেক আমল করে যেতে হবে, যাতে আল্লাহর ইচ্ছায় জান্নাতে আমরা ওর সাথে একত্র হতে পারি।

---

[২৩] দু বছর ক্যান্সারের সাথে লড়াই করার পর ২০১৯ এর ৭ই জুন মারা যায় ড. ইয়াদ কুনাইবীর মেয়ে সারা। এ লেখাটি সারার দাফনের আগে ড. ইয়াদ কুনাইবীর বক্তব্যের লিখিত রূপ।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

যারা ঈমান আনে আর তাদের সন্তানসন্ততিরা ঈমানের সাথে পিতামাতাকে অনুসরণ করে, আমি তাদের সাথে তাদের সন্তানসন্ততিকে মিলিত করব। তাদের 'আমালের কোনো কিছু থেকেই আমি তাদের বঞ্চিত করব না। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়বদ্ধ। [তরজমা, সূরা আত-তূর, ২১]

কিন্তু আমি ওই পিতার দুঃখ কল্পনাও করতে পারি না, যে শৈশবে তার সন্তানকে অবহেলা করে। আর একসময় আবিষ্কার করে সন্তান ভয়ংকর গুনাহতে জড়িয়ে গেছে, কিংবা ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে। আমি ভেবে পাই না কীভাবে এমন অবস্থায় একজন পিতা খাওয়া, ঘুম চালিয়ে যেতে পারে।

তার অন্তর অনুশোচনায় ভরে থাকার কথা। আজকের এই অবহেলার কারণে একসময় পুরো পরিবারও হয়তো দ্বীন ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারে। আবার এমন হতে পারে যে পিতা জান্নাতে কিন্তু সন্তান জাহান্নামে। এ হলো এমন বিচ্ছেদ, যার পর আর মিলন হবে না। মুসলিম বাবা জান্নাতে যাবে আর তার সন্তান ইসলাম ত্যাগ করার কারণে জাহান্নামে যাবে। আল্লাহর কসম! এর চেয়ে তীব্র অনুশোচনার আর কিছু হতে পারে না।

আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

বলো, যারা নিজেদের আর নিজেদের পরিবার-পরিজনকে কিয়ামতের দিনে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। জেনে রেখো, এটাই হলো স্পষ্ট ক্ষতি। [তরজমা, সূরা আয-যুমার, ১৫]

আমার মেয়েটা আমাকে ছেড়ে আল্লাহর কাছে চলে গেছে। আমার বুকটা ভেঙে যাচ্ছে। কিন্তু এ কষ্টের সাথে স্বস্তিও আছে। আমি আল্লাহর সিদ্ধান্তে খুশি, আমি আমার রবের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট। আমি খুশি যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমার মেয়েটাকে এমন অবস্থায় দুনিয়া থেকে নিয়ে গেছেন।

আমার ভাইরা, আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—যদি আপনি কাউকে ভালোবাসেন, আপনার মা, বাবা, স্ত্রী, সন্তান, ভাই-বোনদের ইসলামের ব্যাপারে

নাসীহাহ করুন। তাদের ইসলামের দিকে ডাকুন। তাদের সময় দিন। তাদের নিয়ে উদ্বিগ্ন হোন। মৃত্যুর আগে যেন তাঁরা তাওবাহ করতে পারে সেই চেষ্টা করুন। আপনার সর্বশক্তি এই দিকে দিন।

আজকের এ অবহেলার কারণে আপনার প্রিয় কোনো মানুষ যদি কুফরের ওপর কিংবা বড় কোনো গুনাহের ওপর মারা যায় তাহলে আপনি সারা জীবন আফসোস করবেন। নিজে হিদায়াত পেলেও এই তিক্ততা বয়ে বেড়াতে হবে পুরো জীবন জুড়ে।

আপনাদের প্রতি এই হলো আমার নাসীহাহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা চিন্তা করুন। তাঁর প্রিয় চাচা আবু তালিব যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন আকুল হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বারবার বলেছিলেন,

চাচাজান, আপনি শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন। এটুকু বলুন তাহলে আল্লাহর কাছে আমি আপনার জন্য সুপারিশ করতে পারব। শুধু এইটুকু বলুন, আমি আশা রাখি আল্লাহ আপনার ওপর রহম করবেন।

বলুন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

আবু তালিব তার সারাজীবন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সাহায্য করে গেছেন। তিনি ছিলেন মক্কার কুরাইশদের হামলার সামনে এক দুর্গের মতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য তিনি নিজেকে, নিজের সম্পদ ও সন্তানকে কুরবান করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই রাসূলুল্লাহ ﷺ উদ্‌গ্রীব হয়ে চাচ্ছিলেন প্রিয় চাচাজান তাঁর সাথে জান্নাতে থাকুন।

কিন্তু আবু তালিব মারা গেলেন আব্দুল মুত্তালিবের মিল্লাতের ওপর। তার পূর্বপুরুষদের ধর্মের ওপর। শিরকের ওপর।

চিন্তা করুন এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য কত কষ্টকর ছিল। যতবার আমি বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করি, সহ্য করতে পারি না। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ ﷻ আমাকে এমন এক কন্যা দিয়ে সম্মানিত করেছেন, যে সাবরের সাথে, আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি পূর্ণ সন্তুষ্টি নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে।

যখন একদম দুর্বল হয়ে পড়েছিল, দাঁড়াতে পারত না। মাথা ঘুরে পড়ে যেত। তখনো ঘুম থেকে উঠে বলত, 'আমি যুহরের সালাত পড়িনি। আমি যুহরের সালাত পড়ব।'

ও হিজাব পালন করত। নিজের আচার-আচরণ, চলাফেরায় শরীয়াহর বিধান মেনে চলার চেষ্টা করত। ইসলাম নিয়ে কাউকে কটু মন্তব্য করতে দেখলে আল্লাহ ﷻ-এর জন্যে ও ক্রোধান্বিত হতো। আমাকে বলত, 'বাবা দেখো! এরা দ্বীনদার মানুষদের নিয়ে

কী-সব বলছে! এরা ইসলাম নিয়ে কী বলছে!'

আলহামদুলিল্লাহ আমি আমার রবের ব্যাপারে সুধারণা রাখি। আমি আশা রাখি তিনি আমার মেয়েটাকে সম্মানিত করবেন।

আমার বিশ্বাস—এ দুনিয়াতে আমাদের পাশে থাকার চেয়ে আল্লাহর কাছে থাকা ওর জন্য উত্তম। আমার কাজ এখন সোজা। যেটুকু সময় আমার বাকি আছে সেটা নেক আমলে খরচ করা। যাতে আল্লাহর ইচ্ছায় আখিরাতে আমি আমার মেয়েটার সাথে থাকতে পারি। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বীল আলামীন। আপনারা কষ্ট করে এসেছেন, আল্লাহ ﷻ আপনাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করি, তিনি যেন আপনার প্রিয়জনদের হিদায়েত করার দ্বারা আপনাদের সম্মানিত করেন এবং কোনো শাস্তি ছাড়াই আপনাদের জান্নাতে একত্রিত করেন।

মুছে যায় বিষবৃক্ষ

আমাদের পরিচয় হয় ষোলো বছর আগে। তারপর বন্ধুত্ব। আজকের অনেক সম্পর্কের মতোই একসময় যোগাযোগ আর টান ফিকে হয়ে এল। দিন গেল, মাস গেল, গেল বছর। পার করলাম কিছু কষ্টের সময়। বন্দী হলাম, মহান আল্লাহ মুক্তির ব্যবস্থাও করে দিলেন। বন্ধু একবারও দেখতে এল না। ফোনও দিল না।

একদিন আমিই ফোন করলাম। ফোনের ওপাশের কণ্ঠটা কেমন যেন শীতল মনে হলো। হয়তো ও ঝামেলায় জড়াতে চায় না, তাই আমার সাথে দূরত্ব বজায় রাখতে চাচ্ছে। কিন্তু ওর কিছু হলে আমি ওকে এভাবে ত্যাগ করব না—ভাবলাম আমি।

কেটে গেল আরও কিছু বছর। সারা মারা গেল। সান্ত্বনা জানাতেও যোগাযোগ করল না বন্ধু। একটা ফোনও না। ব্যাপারটা আমার জন্য কষ্টের ছিল। মাথায় দুটো চিন্তা ঘুরতে শুরু করল।

কখনো মনে হতো—ইয়াদ! তোমার আত্মসম্মান বজায় রাখো। যারা তোমার বন্ধুত্ব চায় না তাদের সাথে আগ বাড়িয়ে যোগাযোগ করার কোনো দরকার তোমার নেই। যে তোমাকে ত্যাগ করবে, তুমিও তাকে ত্যাগ করো।

আবার কখনো কখনো মনে হতো—ওকে একটা সুযোগ দিয়েই দেখো না। ওকে জানাও যে ওর আচরণে তুমি কষ্ট পেয়েছ, অসন্তুষ্ট হয়েছ। এরপরও যদি ও মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে আর যোগাযোগ করার দরকার নেই।

নিজের ভেতর থেকেই তখন আবার পালটা প্রশ্ন আসত, কেন আমি তাকে আমার অসন্তোষের কথা জানাব? এতদিন ধরে একবারও ও নিজে থেকে যোগাযোগ করেনি। ও আমার সাথে সম্পর্ক রাখতে চায় না, ব্যাপারটা তো স্পষ্ট। আমি কেন গায়ে পড়ে যোগাযোগ করব?

আবার নিজেই উত্তর দিতাম, তাঁকে জানাও যে তার আচরণে তুমি দুঃখ পেয়েছ। এরপর সে কী করবে না করবে, সেটা নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। শুধু তোমার দিকটা তুমি জানাও। যেন তার বিবেক ও আত্মসম্মানবোধ জেগে ওঠে।

বেশ কয়েক মাস কেটে গেল। তারপর আমি নিচের মেসেজটা পাঠালাম।

'আস সালামু আলাইকুম

ড. ... কেমন আছেন?

অনেক বছর ধরে একটা জিনিস আমার মনে গেঁথে আছে। আমি সেটা আজ আপনাকে জানাতে চাই।

আমি মানুষকে বলতাম ড. ... একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে ভালোবাসেন। আমি বলতাম আপনার সাথে কাটানো সুন্দর সময়গুলোর কথা। আমার মনে পড়ে নবীজি ﷺ-এর রওজার সামনে দাঁড়িয়ে আপনার অঝোর কান্না নিয়ে আমরা একবার অনেকক্ষণ কথা বলেছিলাম।

সত্যি কথা বলতে কী, আমার কষ্টের সময়ে আপনার কাছ থেকে যে আচরণ আমি পেয়েছি, যে উপেক্ষা পেয়েছি, সেটা মেনে নেয়া আমার জন্য কঠিন। আমি বুঝি, আপনি ঝামেলায় জড়াতে চান না। কিন্তু আপনার মতো আত্মমর্যাদাবোধ-সম্পন্ন ব্যক্তির নিশ্চয় জানা আছে, মৃত্যুর কিছু আলাদা নিয়ম আছে। সাধারণ সময়ের অনেক বিষয় মৃত্যুর বেলায় খাটে না। অনেক মান-অভিমান, ক্ষোভ, অভিযোগ মৃত্যুর সময় সরিয়ে রাখতে হয়। তাই আমার মেয়ের মৃত্যুর সময়ও যে আপনি যোগাযোগ করবেন না, এটা আমি কল্পনাও করিনি।

নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আপনার কাছ থেকে আমি কোনো কিছু চাই না। আপনার কাছ থেকে কোনো ক্ষতির আশঙ্কাও আমি করি না। কিন্তু আমি অসন্তুষ্ট, আমি ব্যথিত। কারণ, আমি আপনার কাছ থেকে এমন আচরণ আশা করি না।'

আমাকে অবাক করে দিয়ে পর দিন মেসেজের উত্তর আসল।

'ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমতুল্লাহ।

ওয়াল্লাহি, আপনি আমার অন্তরের খুব কাছের একজন মানুষ। আল্লাহ ﷻ সাক্ষী, আপনি যখন পরীক্ষাগুলোর মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন আমি সিজদাহয় আপনার জন্য দু'আ করতাম। মহান আল্লাহ সাক্ষী, আপনার এ ভাই আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার জন্য দু'আ করত। এত দীর্ঘ সময় আপনার সাথে দেখা না হওয়ার একমাত্র

কারণ হলো আমার গাফেলতি। আর কিছু না।

আমাকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহকে সাক্ষী করে বলছি, আমি আল্লাহর জন্যই আপনাকে ভালোবাসি এবং তিনি জানেন আপনি আমার কতো প্রিয় একজন মানুষ।'

তারপর তিনি ফোন করলেন। আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বললেন, নিজের আপন ভাইয়ের মতো তিনি আমাকে ভালোবাসেন। কিন্তু কঠিন কিছু পরিস্থিতি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় তিনি যোগাযোগের সুযোগ পাননি।

আমরা দেখা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। ফোন রাখার পর উপলব্ধি করলাম, উনি নিজে এখন যে কষ্টের সময় পার করছেন তখন আমারই উচিত তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ান। কিন্তু তাঁর অবস্থার কথা না জানার কারণে আমি তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট ছিলাম।

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর শোকর যে আমি তাঁকে সেই মেসেজটা পাঠিয়েছিলাম। আল্লাহর শোকর যে গর্ব আর আত্মমর্যাদাবোধের কারণে আমি তার সাথে যোগাযোগ করা থেকে বিরত থাকিনি।

আমরা যাদের ভালোবাসি, যাদের ভালো বলে জানি তাদের সংশোধনের সুযোগ দেয়া উচিত। মর্যাদাবোধ এখানে বাধা হয়ে দাঁড়ানো উচিত না।

আমাদের উচিত আল্লাহ ﷻ-এর এই আয়াতের বাস্তবায়ন করা,

أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ

...তারা মুমিনদের ওপর বিনম্র এবং কাফিরদের ওপর কঠোর হবে...[তরজমা, সূরা মা'ইদা, ৫৪]

হুনাইনের যুদ্ধের পর বিভিন্ন গোত্রপ্রধান ও মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ গনীমাহ বণ্টন করেন। যদিও তাঁদের বেশির ভাগই ছিল সম্পদশালী। এটি ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি কৌশল। তিনি এমনভাবে গনীমাহ বণ্টন করলেন, যাতে নবদীক্ষিত এ মুসলিমরা ইসলামের ওপর দৃঢ় থাকে। যারা মাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের অন্তরকে ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে যুক্ত করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের গনীমাহ দিয়েছিলেন।

এতে আনসারগণ رضي الله عنهم দুঃখ পেয়েছিলেন। তাঁদের মনে অসন্তোষ জন্মেছিল। এই দুঃখ আর অসন্তোষ তাঁরা চেপে রাখেননি। কারণ, তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ভালোবাসতেন। তাঁরা رضي الله عنهم চাননি এ ভালোবাসায় কোনো দাগ পড়ুক। তাই কষ্টকে চেপে না রেখে তাঁরা رضي الله عنهم রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তাঁদের মনের কথা খুলে বললেন।

তাঁদের এ অসন্তোষের কথা শোনার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝিয়ে বললেন-

এই জিনিসের (গনীমাহ) মাধ্যমে আমি কিছু লোকের মনে প্রবোধ দিয়েছি, যাতে তারা মুসলিম হয়ে যায়। আর তোমাদের তোমাদের গৃহীত ঈমানের ওপর ছেড়ে দিয়েছি। হে আনসার, তোমরা কি এতে খুশি না যে, অন্যরা উট আর বকরি নিয়ে ঘরে ফিরবে আর তোমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাথে ঘরে ফিরবে? যদি সব লোক এক পথে চলে আর আনসাররা অন্য পথে চলে, তবে আমি আনসারদের পথেই চলব। হে আল্লাহ, আপনি আনসারদের ওপর, তাঁদের সন্তানদের ওপর এবং তাঁদের পৌত্রপৌত্রীদের ওপর রহম করুন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা আনসার ﷺ-রা কাঁদতে শুরু করলেন। তাঁদের দাড়ি ভিজে গেল। তাঁদের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভালোবাসা, মায়া আর টান দেখে তাঁরা অভিভূত হয়ে গেলেন। তাঁরা বললেন, আমাদের অংশে রাসূলুল্লাহ ﷺ থাকবেন, এতে আমরা সন্তুষ্ট।[২৪]

অসন্তুষ্টির প্রকাশ ঘটল, তারপর বিষয়গুলো পরিষ্কার করা হলো। সব জটিলতা দূর হয়ে গেল এবং অন্তরগুলো আবার আবদ্ধ হলো ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে। ভালোবাসা প্রোথিত হলো হৃদয়ের আরও গভীরে।

তাই যদি সব সময় চেষ্টা করবেন নিজের ভালোবাসার মানুষগুলোকে নিয়ে অন্তরে কোনো ক্ষোভ, অভিমান না রাখতে। তাদের ওপর অসন্তুষ্ট হবার আগে তাদের জন্য অজুহাত খুঁজুন। আর যদি সেটা না পারেন, তাহলে তাদের নিজের অসন্তোষের কথা জানান। কিন্তু কখনো তাদের অপমান করবেন না। শয়তানকে সুযোগ দেবেন না আপনার হৃদয়কে বিষিয়ে তুলতে।

[২৪] আর রাহীকুল মাখতুম, সফিউর রহমান মুবারাকপুরী

সন্ধিক্ষণ

অনেক সময় আমরা যুলুম, অবিচার ঘটতে দেখি। বেশির ভাগ মানুষ এমন পরিস্থিতিতে সঠিক কাজটা করতে পারে না। 'আমার এখন কী করা উচিত?'—এ প্রশ্নের উত্তরটা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না মানুষ। এমন সময়ে কী করণীয় তা বোঝা এবং তা করতে পারা বান্দার প্রতি আল্লাহ ﷻ-এর সবচেয়ে বড় রাহমাহগুলোর একটি।

এমন পরিস্থিতিতে অনেক মানুষের মনে সংশয় মাথাচাড়া দেয়। প্রশ্ন জাগে,

'কেন আল্লাহ এত-সব অন্যায় অবিচার হতে দিলেন?'

অন্তরে এ ধরনের প্রশ্ন জড়ো হওয়ার ফলাফল হলো আল্লাহ ﷻ সম্পর্কে মন্দ ধারণা করা। যার ফলে তৈরি হয় অসহায়ত্ব ও হতাশার অনুভূতি। সংশয়ে ভোগা মানুষের জন্যে এই অসহায়ত্ব আর হতাশা আবির্ভূত হয় নতুন এক পাহাড়সম বোঝা হয়ে। একের পর এক ঝড় বইতে থাকে মনের ঘরে। মন হয়ে পড়ে অবশ, মানুষ হয়ে যায় নিষ্ক্রিয়। আর ওদিকে সমাজে বাড়তে থাকে অন্যায় ও অবিচার।

কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে রাহমানুর রাহীম যাকে পথ দেখিয়ে দেন, তাঁর প্রতিক্রিয়া কেমন হয়?

সে নিজেকে প্রশ্ন করে,

'আমার দায়িত্ব কী? এ মুহূর্তে আমার করণীয় কী? এই অন্যায় ও অবিচারের মোকাবিলায় আমার পক্ষে কী করা সম্ভব?

সে বোঝে, অন্যায়-অবিচারের মাত্রা যত বেশি হবে তাঁর দায়িত্বও তত বাড়বে। পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হবে তাঁর সংকল্প তত দৃঢ় হতে হবে। যে বান্দা এমন অবস্থায় হিদায়াতের ওপর অবিচল থাকবে, রাব্বুল আলামীন তাঁকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেবেন। তাঁকে দেখাবেন অসাধারণ সব ফলাফল। নিপীড়িতদের প্রতি আল্লাহ ﷻ-এর রাহমাহর একটি

মাধ্যমে পরিণত হবে সে। তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহ ﷻ তাদের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করবেন, তাদের চোখের পানি মুছে দেবেন, ভুলিয়ে দেবেন সমস্ত বিষাদ-বেদনা।

সে অবাক বিস্ময়ে দেখবে তাঁর কথা ও কাজের অপ্রত্যাশিত ফলাফল। সে দেখবে তাঁর কাজের প্রভাব এতদূর ছড়িয়েছে, যা তাঁর কল্পনাতেও ছিল না। মহান আল্লাহ ﷻ তাঁর কাজে বারাকাহ দেবেন।

আমাদের কাজ তো শুধু চেষ্টা করা, সফলতা দেয়ার মালিক আল্লাহ ﷻ।

আর এ সবই সম্ভব হবে; কারণ, এই ব্যক্তি আল্লাহ ﷻ-এর হিকমাহ ও রাহমাহ নিয়ে সন্দেহ-সংশয়ে সময় নষ্ট করেনি। সে কাজ করেছে। সংশয় আর হতাশার চক্রে বাঁধা না পড়ে সে নিজের দায়িত্ব খুঁজে নিয়েছে। রাব্বুল আলামীন যে দায়িত্ব তাঁর সামনে দিয়েছেন নিষ্ঠার সাথে সে তা পালন করে গেছে। ভরসা রেখেছে আল্লাহর নির্ধারিত তাকদিরের ওপর। নিশ্চয়ই তিনি প্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞানী।

আর এ কারণেই সে আল্লাহ ﷻ-এর প্রতিশ্রুতি সত্য পেয়েছে। আল্লাহ ﷻ বলেন:

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদই আপতিত হয় না। যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ তাঁর অন্তরকে সৎপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বজ্ঞ। [তরজমা, সূরা আত-তাগ্বাবুন, ১১]

এবং তিনি ﷻ বলেন:

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

তিনি (আল্লাহ) যা করেন, সে ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবে না; বরং তাদেরই প্রশ্ন করা হবে। [তরজমা, সূরা আল-আম্বিয়া, ২৩]

বান্দা যখন একনিষ্ঠভাবে দায়িত্ব পালন করে তখন আল্লাহ ﷻ তাঁকে পথ প্রদর্শন করেন। পরীক্ষা, বিপর্যয়, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়ের পেছনের হিকমাহ ধীরে ধীরে তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়।

বিপর্যয়ের সামনে মানুষ হয় ভেঙে পড়ে অথবা প্রতিরোধ করে। এ সময়টাতে মানুষ কী সিদ্ধান্ত নেয় তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি হলো সন্ধিক্ষণ। এ মুহূর্তে শয়তান আপনাকে আক্রমণ করবে। মহান আল্লাহর সম্পর্কে সংশয়-সন্দেহের চোরাবালিতে টেনে নিয়ে যাবার জন্য ক্রমাগত ওয়াসওয়াসা দিতে থাকবে আপনার অন্তরে। তাকে শক্ত হাতে

প্রতিহত করুন এবং বলুন :

"কোনটি উত্তম তা আল্লাহই ভালো জানেন এবং তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি পরম করুণাময়। নিশ্চয়ই তিনি মহা প্রজ্ঞাবান।"

আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নিজেকে প্রশ্ন করা :

"আমার ভূমিকা কী? আমার এখন কী করা উচিত?"

বিপদের সময় আল্লাহ ﷻ-এর ওপর দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে এ মানসিকতার সাথে এগিয়ে গেলে আল্লাহর অপার রহমতের দেখা মিলবে। আপনার মুখের সাধারণ একটি কথাতেও আল্লাহ তাঁর বারাকাহ্ তখন ঢেলে দেবেন। নিপীড়িত মানুষের কষ্ট-ভারাক্রান্ত অন্তরে প্রশান্তির কোমল পরশ এনে দেবে আপনার সেই কথা। মস্তিষ্কে জমাটবাঁধা নিপীড়নের দুর্বিষহ স্মৃতি আপনাকে অবশ করবে না। টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাবে না হতাশার গোলকধাঁধায়; বরং এ স্মৃতি আপনাকে উদ্বুদ্ধ করবে। চালিত করবে উম্মাহ ও মানবতার কল্যাণে কাজ করার জন্যে। কেন আল্লাহ ﷻ বিপর্যয়ের ফায়সালা করেন, তার পেছনের হিকমাহ আপনার কাছে পরিষ্কার হবে। রাব্বুল আলামীন সম্পর্কে খারাপ ধারণা মনের ভেতরে পুষে রেখে কেবল ঘরে বসে ভাগ্যকে দোষারোপ করলে এগুলো কখনোই সম্ভব হয়ে উঠত না।

এ কারণে সব সময়, সব পরিস্থিতিতে, স্মরণ রাখুন মহান আল্লাহ ﷻ-এর এ কালাম:

ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ

এটাই বিধান। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারতেন কিন্তু তিনি তোমাদের একজনকে অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান...।
[তরজমা, সূরা মুহাম্মাদ, ৪]

নিঃসন্দেহে আল্লাহ ﷻ যেকোনো মন্দ থামিয়ে দিতে, যেকোনো যুলুম বন্ধ করতে সক্ষম। কিন্তু আল্লাহ ﷻ বলে দিয়েছেন, তিনি '...একজনকে অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান।'[২৫]

তিনি ﷻ দেখতে চান তাঁর ক্বাদরের ফায়সালা কীভাবে আমরা গ্রহণ করি। তিনি যাচাই করতে চান বিপদের মুখোমুখি হয়ে আমরা কেমন আচরণ করি।

---

[২৫] সূরা মুহাম্মাদ, ৪

তাই এই সন্ধিক্ষণ গুলোতে নিজের করণীয়ের দিকে মনোযোগী হোন। সচেষ্ট হোন নিজ দায়িত্ব পালনে। শয়তানকে সুযোগ দেবেন না আপনাকে হতাশার চোরাবালিতে টেনে নিয়ে যাবার।

অভ্যন্তরীণ বিষয়!

পাশের বাসায় ডাকাত পড়েছে। অপ্রস্তুত অবস্থায় বাড়ির পুরুষরা চেষ্টা করছে যা আছে তাই দিয়ে ডাকাতদলের মোকাবেলার। শিশুরা পালিয়ে এসে কড়া নাড়ছে আমার দরজায়।

কিন্তু আমি দরজা খুললাম না।

অথবা খুললাম তবে অল্প করে। সেটাও আবার বেশ কিছু নারীশিশুর ধর্ষণ আর হত্যা শেষে পুরুষদের রাস্তায় টেনে বের করে আনার পর।

এমন অবস্থায় আমাকে কি দোষ দেয়া যায়?

আমি কি আত্মপক্ষ সমর্থনে বলতে পারি :

'আমার ঘর, আমার নিয়ম। আমার যখন ইচ্ছে দরজা খুলব, যখন ইচ্ছে বন্ধ করব। কারও অধিকার নেই আমাকে বাধ্য করার।'

অথবা, 'এটা ওদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এসব নিয়ে আমার কেন মাথাব্যাথা?'

আজকাল অনেক মানুষ তো এমন কথাই বলে, তাই না? পথে-ঘাটে-অফিসে-অনলাইনে নিয়মিত এ ধরনের কথা আমরা শুনি।

আচ্ছা, আল্লাহ ﷻ কি বলেননি?

وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ

আর যদি তারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের নিকট কোনো সহযোগিতা চায়, তাহলে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। [তরজমা, আল-আনফাল, ৭২]

তিনি ﷻ কি বলেননি?

وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

তোমাদের এসব উম্মাত তো একই উম্মাত (যারা একই দ্বীনের অনুসরণ করে), আর আমিই তোমাদের প্রতিপালক, কাজেই আমাকেই ভয় করো। [তরজমা, সূরা আল-মু'মিনুন, ৫২]

নবী ﷺ কি বলেননি,

ما من امرئٍ مُسلمٍ يخذُلُ امرأً مسلمًا في موضعٍ تُنتَهكُ فيه حرمتُه، ويُنتقَصُ فيه من عِرضِه إلّا خذله اللهُ في موطِنٍ يُحِبُّ فيه نُصرتَه

যে মুসলিম অপর কোনো মুসলিমের সম্মানহানি করা হলে কিংবা মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করা হলে তার সাহায্যে এগিয়ে আসে না, আল্লাহও তাকে এমন জায়গায় সাহায্য করবেন না, যেখানে সে আল্লাহর সাহায্য চায়।[২৬]

এগুলো কোনো অভিযোগ না। শুধুই প্রশ্ন।

এ প্রশ্নগুলোর উত্তর যারা এখনো খুঁজে পাচ্ছেন না, কাল তারা উত্তরগুলো ঠেকে শিখবেন। উত্তরগুলো তখন জেনে নিতে হবে রক্তের দাম দিয়ে।

---

[২৬] সুনান আবু দাউদ, ৪৮৮৪; মুসনাদ আহমাদ, ১৬৩৬৮

মুসলিমের রক্ত আজ সস্তা কেন?

মিডিয়ার অন্তহীন প্রপাগ্যান্ডা আমাদের মানসিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে। আমাদের অজান্তেই। ম্যাস মিডিয়ার মায়াজালে আটকে পড়ে একসময় অবশ হয়ে আসে আমাদের অনুভূতিগুলো। আমরা অবচেতনভাবে ভাবতে শুরু করি মুসলিমদের রক্ত সস্তা। আর অন্যদের রক্ত দামি।

সিরিয়া, বার্মা, কাশ্মীর, ইরাক, আফগানিস্তান, মিসর, আরাকান, ফিলিস্তিন, পূর্ব তুর্কিস্তান—পৃথিবীর নানা প্রান্তে মুসলিমদের নিয়মমাফিক হত্যা করা হয় প্রতিদিন। অবস্থা এমন হয়ে গেছে যে, 'ডজনের বেশি নিহত' কথাটার বিশেষ কোনো অর্থ আর আজ আমাদের কাছে নেই। আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আমরা অবশ হয়ে গেছি। আমাদের বিবেকের পাল্লায় কয়েক ডজন মুসলিম লাশ তেমন একটা ভারী মনে হয় না। কারণ, আমরা প্রতিদিন দেখি ম্যাস মিডিয়া ভাবলেশহীন মুখে মুসলিম নিধনের খবর দিয়ে যাচ্ছে। দিকে দিকে মুসলিমদের খুন করা হলেও, সবাই এটাকে ধরে নিয়েছে স্বাভাবিক হিসেবে। যেন এতে চিন্তিত হবার কিছু নেই। উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই। এটাই রুটিন।

অন্যদিকে একজন কাফির মারা গেলে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে পুরো পৃথিবী। ইস্রাইলি সন্ত্রাসী বাহিনীর সৈনিক গিলাদ শালিত যখন বন্দী হয়েছিল তখন ইস্রাইল কী করেছিল? ওদের সেনাবাহিনী আর বিমানবাহিনী পুরো শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল গাযার ওপর। হত্যা করেছিল এক হাজারের বেশি মুসলিমকে। কারাগারে বন্দী মুসলিমদের ওপর চালাচ্ছিল নতুন নতুন সব টর্চার। আর এই টর্চারগুলোর নাম দিয়েছিল, 'শালিতের জন্য শাস্তি'। শালিতকে নিয়ে বন্দী-বিনিময় চুক্তি হবার আগে ফিলিস্তিনের শত শত মুসলিমদের বন্দী করেছিল ইহুদীরা। এই সবকিছু করা হয়েছিল, শুধু একজন ইহুদী সন্ত্রাসীর জন্য।

ওরা আসলে আমাদের একটা মেসেজ দিচ্ছিল। আন্তর্জাতিক মিডিয়ার মাধ্যমে সাধারণ

মানুষের মনে গেঁথে দিচ্ছিল একটা বার্তা—একজন ইহুদী বন্দীর দাম হাজারো মুসলিমের প্রাণের চেয়ে বেশি। তাদের একজন তো পত্রিকায় কলাম লিখে বলেওছিল, 'অনস্বীকার্য সত্য হলো, আমাদের একজনের দাম ওদের হাজার জনের সমান।'

অন্যদিকে ২০১৩ এর এক কালো দিনে মিসরে হত্যা করা হয় হাজারেরও বেশি মুসলিমকে। হত্যাকাণ্ড চালায় মিসর রাষ্ট্র, সেনাবাহিনী, প্রশাসন। যে রাষ্ট্র আর সেনাবাহিনীর দায়িত্ব ছিল সিনাই উপত্যকায় চালানো ইস্রাইলী আগ্রাসন ও হত্যাকাণ্ডের জবাব দেয়া, সেই সেনাবাহিনী আর রাষ্ট্র ব্যস্ত ছিল মুসলিম নিধনে।

ফ্রান্সের একজন নাগরিক যখন মুসলিমদের হাতে বন্দী হয়, তখন মিডিয়ার মাথা খারাপ হয়ে যায়। এক্সক্লুসিভ কাভারেজ চলে দিনরাত। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাকে নিয়ে চলে কনফারেন্স, সেমিনার, এই সেই আরও কত কী! তার নিরাপত্তা নিয়ে নিশ্চিত হবার আগে এই উৎকণ্ঠা কমে না। অন্যদিকে শুধু অ্যামেরিকান দূতাবাসের কাছে বিক্ষোভ করার কারণে তিউনিশিয়াতে আহত হতে হয় কয়েক ডজন মুসলিমকে, বন্দী করা হয় আরও কয়েক শ'কে।

কোন মূর্খ সেক্যুলারিস্ট কিংবা 'মুক্তমনা' যখন ইসলামকে আক্রমণ করে, তখন সে পশ্চিমের চোখের মণি হয়ে যায়। 'সত্যের মশালধারী'-কে নিয়ে শুরু হয়ে যায় আদিখ্যেতা। তার জন্য চলে আসে ইউরোপের ভিসা। রাতারাতি সে বনে যায় 'বিজ্ঞানী' কিংবা মহান চিন্তক। আজ যেকোনো আরব কিংবা বাদামি চামড়ার মুসলিমের জন্য 'গুরুত্বপূর্ণ' হয়ে ওঠার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো ইসলামকে আক্রমণ করা। এটা করে ফিরিঙ্গি বাবুর জাতে ওঠা যায় একেবারে শর্টকাটে।

এসব লোকের ব্যাপারে শরীয়াহর বিধান কী, সেটা আমাদের আলোচনার বিষয় না। তবে অবশ্যই কিছু প্রশ্ন এখানে আসে। এ ধরনের মানুষদের নিয়ে পশ্চিমাদের এত মাথাব্যথা কেন? তথাকথিত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কেন শুধু এদের নিরাপত্তা নিয়েই উদ্বিগ্ন হয়? অ্যামেরিকান সেনারা যখন আফগানিস্তানে আমাদের মুসলিমদের ভাইদের হাতের আঙুল কেটে নেয়, হত্যা করার পর তাঁদের মৃতদেহ জ্বালিয়ে দেয়, তাঁদের লাশের ওপর দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে, তাঁদের শরীরের গোশত নিজেদের কুকুরদের খেতে দেয়, তখন তো টুঁ শব্দটা শোনা যায় না। তখন কেন পশ্চিমারা কথা বলতে ভুলে যায়? আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তখন কোথায় থাকে? মানবতার গালভরা বুলি তখন কোথায় হারিয়ে যায়?

বরং এসব ব্যাপারে অ্যামেরিকান সেনাবাহিনীর বক্তব্য জানতে চাওয়া হলে তারা ভাবলেশহীন মুখে জবাব দেয়, 'আমরা বিষয়টা তদন্ত করে দেখছি।'

ওরা আমাদের রক্ত নিয়ে তামাশা করে। কারণ, মুসলিমদের রক্ত ওদের কাছে সস্তা। পানির চেয়েও সস্তা।

এ তো গেল ওদের কথা। কিন্তু আমাদের কী অবস্থা?

আমাদের কাদেরকে নিয়ে চিন্তা করা উচিত? সিরিয়া, আরাকান, কাশ্মীর কিংবা পূর্ব তুর্কিস্থানে খুন হওয়া মুসলিম শিশু কিংবা ধর্ষিত মুসলিম নারী? নাকি ওইসব পশ্চিমা লোকজন, যাদের নিয়ে চিন্তিত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় আর মিডিয়া? কোন রক্তের মূল্য আমাদের কাছে বেশি?

প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় অ্যামেরিকার তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ম্যাডেলিন অলব্রাইটকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, এ যুদ্ধে প্রায় ৫ লক্ষ ইরাকি শিশু প্রাণ হারিয়েছে। এই যে পাঁচ লক্ষ শিশুর জীবন দিতে হলো, যুদ্ধের লাভ-ক্ষতির হিসেবে তা কি উপযুক্ত মনে করেন?

জবাবে সে বলেছিল, 'আমার মতে এটা বেশ কঠিন একটা সিদ্ধান্ত। তবে আমরা মনে করি যে, বিনিময়ে আমরা যা পাচ্ছি তার তুলনায় এই দাম ঠিকই আছে।'

অর্থাৎ অ্যামেরিকান সাম্রাজ্যের প্রসারের জন্য যদি ৫ লাখ মুসলিম শিশুকে হত্যা করতে হয়, তবে তাই সই। এতে ওদের কোনো সমস্যা নেই। কোনোরকম দ্বিধাদ্বনন্দ্ব ছাড়া এমন সিদ্ধান্ত ওরা নিতে পারে। এই হলো আমাদের শত্রুর নৈতিকতার অবস্থা। ওরা যুদ্ধ করে এমন নিয়মে।

আবু গ্বুরাইব আর গুয়ানতানামোর নারকীয় নির্যাতনের নতুন কোনো ছবি প্রকাশিত হতে দেখলে নিশ্চিত থাকবেন এগুলো অ্যামেরিকান প্রশাসনের অজান্তে বের হয়নি; বরং ওদের সম্মতি নিয়েই মিডিয়াতে এগুলো প্রচার করছে। এসব ছবির মাধ্যমে ওরা আমাদের একটা মেসেজ দিতে চায়। ওরা আমাদের মনোবল ভেঙে দিতে চায়। ওরা চায় আমরা যেন নিজেদের তুচ্ছ, মূল্যহীন মনে করি। এই ছবিগুলো দেখিয়ে কাফিররা আসলে আমাদের বলছে,

> 'ও মুসলিম, এই যে দেখো আমরা তোমাদের ন্যাংটো করে গলায় শেকল দিয়ে ঘোরাচ্ছি। আমাদের এক নারী সৈনিক শেকল ধরে টানছে। আর তোমরা তার পেছনে কুকুরের মতো হামাগুড়ি দিতে বাধ্য হচ্ছ। এই হলো আমাদের সামনে তোমাদের অবস্থা। উলঙ্গ, অপমানিত। এই হলো আমাদের ক্ষমতা। তোমরা আমাদের কাছে কুকুরেরও অধম।
>
> এখন কী করবে করো। যা পারো করে দেখাও। পারলে আমাদের ঠেকাও।'

দিনের পর দিন মিডিয়া থেকে আমরা যখন এই মেসেজগুলো পাই তখন এর ছাপ পড়ে আমাদের চিন্তার ওপর। দিনের পর দিন আমরা যখন মুসলিমনিধনকে স্বাভাবিক হিসেবে উপস্থাপিত হতে দেখি আর আগ্রাসনের প্রতিরোধকে সন্ত্রাস হিসেবে, তখন ধীরে ধীরে সেটা আমাদের মাথায় গেঁথে যায়। এ বিষয়গুলো আজ আমাদের এতটাই প্রভাবিত করেছে যে, মিসরে যখন শত শত মুসলিমকে হত্যা করা হচ্ছিল, তখন আমাদের মধ্যে অনেকে সেটাকে সমর্থন করছিল। এর ফলে জনজীবন নাকি আবার 'স্বাভাবিক' হবে। অথচ এ সময় শুধু মুসলিমদের হত্যা করা হচ্ছিল না; বরং হত্যার পর অনেকের দেহ জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছিল। হাসিতামাশা করা হচ্ছিল মুসলিমদের মৃতদেহ নিয়ে।

মিডিয়ার চতুর মেসেজিং আমাদের মনকে প্রভাবিত করে। অবচেতনভাবে আমরা বিশ্বাস করতে শুরু করি যে মুসলিমদের জান সস্তা। মুসলিমদের রক্ত মূল্যহীন। আর কাফিরদের জান-মাল-সম্মান খুব দামি কিছু একটা। আর এভাবে একসময় আমাদের পুরো চিন্তাভাবনা বদলে যায়। হিসেবনিকেশ উল্টো হয়ে যায়। মুসলিমদের রক্ত আমাদের কাছে সস্তা হয়ে যায়, আর কাফিরের রক্ত দামি। মুসলিমদের হত্যা করা হবে, আমাদের মা-বোন-স্ত্রী-কন্যারা ধর্ষিত হবে, আমাদের সন্তানরা পঙ্গু হবে, অনাথ হবে, নিহত হবে—এটাই স্বাভাবিক। কাফির মরলে সেটা অস্বাভাবিক। মুসলিম মার খাবে, এটা স্বাভাবিক। মুসলিম প্রতিরোধ করলে, পালটা আঘাত করলে, সেটা অস্বাভাবিক।

আমাদের নির্যাতিত মুসলিম ভাইবোনদের নিয়ে চিন্তা করা বন্ধ করে দিই আমরা। প্রতিরোধ আর প্রতিশোধের স্বপ্ন দেখতেও ভুলে যাই। কখন যেন অভিযোগের তির তাক হয় আমাদের দিকে—সব সময় আশঙ্কায় থাকি । যখন একজন কাফিরেরও কোনো ক্ষতি হয় তখন আমরা রক্ষণাত্মক হয়ে যাই। 'নিন্দা জানানোর' মুখস্থ স্ক্রিপ্ট নিয়ে কাফিরের আগে ছুটে যাই আমরা। পাছে কাফির কিছু বলে!

আমার ভাই ও বোনেরা, এই মনস্তাত্ত্বিক আগ্রাসন থেকে নিজেদের বাঁচাতে হবে। এই মানসিক বিচ্যুতির ব্যাপার সতর্ক হতে হবে। সামরিক আগ্রাসনের চেয়েও মনস্তাত্ত্বিক এ আগ্রাসন বেশি ভয়ংকর।

আল্লাহ ﷻ-এর শরীয়াহতে একজন মুসলিমের জীবনের দাম কত, সেটা মনে রাখতে হবে। মুসলিমের জান-মাল-সম্পদের নিরাপত্তা শরীয়াহর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর একটি। যদি আপনি জানতে চান কোনো রাষ্ট্র আসলেই শরীয়াহ দ্বারা শাসিত হয় কি না, তাহলে সেই রাষ্ট্রে মুসলিমের রক্তের মূল্য কত, সেটা দেখুন। সত্যিকারের ইসলামী রাষ্ট্রে প্রতিটি মুসলিমের জীবন, সম্পদ ও সম্মান সুরক্ষিত থাকে।

যখন সে আক্রান্ত হয় তখন তার প্রতিরক্ষায় এগিয়ে আসে রাষ্ট্র। যখন কেউ তার অধিকার ছিনিয়ে নেয়, রাষ্ট্র তখন সেই হামলাকারীর কাছ থেকে তার অধিকার ফিরিয়ে আনে। আর আমরা এই শরীয়াহ্ এবং এমন ইসলামী রাষ্ট্রের দিকেই আহ্বান করি।

আজকের তথাকথিত উন্নত বিশ্ব গর্ব করে বলে, তারা নাকি মানবাধিকার রক্ষায় সেনাবাহিনী পাঠায়। কিন্তু এর চেয়ে অনেক বেশি মহান দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। মদীনার ইহুদী গোত্র বনু কায়নুকার কয়েকজন মিলে একজন মুসলিম নারীর পর্দা সরিয়ে দিয়েছিল। প্রতিবাদে একজন মুসলিম এগিয়ে আসায় তাঁকেও ﷺ হত্যা করেছিল এই ইহুদীরা। এ অপরাধের কারণে মুসলিম বাহিনী নিয়ে পুরো বানু কায়নুকাকে গোত্রকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। তারপর মদীনা থেকে বিতাড়িত করেছিলেন তাদের। আজ যখন আমাদের মুসলিম বোনদের ধর্ষিত হবার খবর শুনবেন তখন এ দৃষ্টান্তের কথা মনে রাখবেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধির আগে গুজব ছড়িয়ে পড়ে, মক্কার মুশরিকরা উসমান ﷺ-কে হত্যা করেছে। শুধু একজন মুসলিমের রক্তের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাঁর সাহাবী ﷺ-দের কাছ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত লড়াই করার শপথ নেন। ইতিহাসে এ ঘটনা বাইয়াতুর রিদ্বওয়ান নামে প্রসিদ্ধ।

মু'তার যুদ্ধের আগে গ্বাসসান গোত্র যখন বসরায় পাঠানো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দূতকে হত্যা করে, তখন তিনি এক সেনাবাহিনী পাঠান। তিনি ﷺ জানতেন যে এ এক অসম যুদ্ধ হবে। কাফিরদের সংখ্যা ছিল অনেক, অনেক বেশি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তবুও মুসলিম বাহিনীকে পাঠিয়েছিলেন। কারণ, একজন মুসলিমের জীবনের গুরুত্ব এবং একজন মুসলিম আক্রান্ত হলে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া কেমন হওয়া উচিত, তার দৃষ্টান্ত পুরো পৃথিবী এবং পরবর্তী প্রজন্মগুলোর জন্যে তিনি ﷺ রেখে যেতে চেয়েছিলেন।

মা'আন অঞ্চলের গর্ভনর ফারওয়া বিন আমার আল জুদানী খ্রিষ্ট ধর্ম ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তাঁকে হত্যা করে রোমানরা। এই হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রস্তুত করেন উসামা বিন যাইদ ﷺ-এর বাহিনীকে।

ইসলামী রাষ্ট্রে আর কেউ একজন মুসলিমের চেয়ে বেশি মূল্যবান না।

এমনকি যেসব মুসলিম খালিফাহরা যুলুম করতেন তারাও শত্রুর সামনে মুসলিমের রক্তের এই পবিত্রতা টিকিয়ে রাখতেন। আব্বাসী খালিফাহ আল-মু'তাসিম যালিম শাসক হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু একজন মুসলিম নারী যখন রোমানদের হাতে বন্দী হবার পর চিৎকার করে বললেন, ওয়া মু'হতাসিমা! হে মু'হতাসিম! তুমি কোথায়?

তখন একজন মুসলিম নারীর জন্য তিনি এক সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিলেন।

কিছু মূর্খ মু'হতাসিমের সাথে আজকের শাসকদের তুলনা করতে চায়। তারা বলতে চায়—মুহ'তাসিমও যুলুম করত আর আজকের শাসকেরাও যুলুম করে। তাই তারা একই শ্রেণির। তাদের প্রতি আমাদের আচরণ একই রকম হওয়া উচিত।

কী নির্বোধের মতো কথা!। 'হে মু'হতাসিম', এর মতো চিৎকার আজ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। পৃথিবীর নানান কোনায় আকাশে-বাতাসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আমাদের নির্যাতিত বোনদের আর্তনাদ। সেই আর্তনাদের ধ্বনি আজকের এ শাসকদের কানেও পৌঁছেছে। কিন্তু তা তাদের হৃদয়কে স্পর্শ করেনা। অন্যদিকে সেই মুসলিম নারীর আর্তনাদ স্পর্শ করেছিল মু'হতাসিমের হৃদয়কে। একজন মুসলিম নারীর চিৎকারে প্রকম্পিত হয়েছিল মু'তাসিমের বুক। জ্বলে উঠেছিল আগুন। কিন্তু আজ হাজার হাজার মুসলিম বোনের চিৎকার শোনার পরও এসব শাসকদের অন্তরে মর্যাদাবোধ, ক্রোধ আর প্রতিশোধস্পৃহা জাগে না।

যখন নাভার রাজ্যের খ্রিষ্টানরা[২৭] আন্দালুসের তিন জন মুসলিম নারীকে বন্দী করেছিল তখন তাঁদের মুক্ত করার জন্য একটি বাহিনী পাঠিয়েছিলেন আল-হাজ্জ বিন মানসুর। তাই ইউরোপ তাঁকে সম্মান করত। ভয় পেত। তার মৃত্যুর পর তখন ইউরোপ উৎসব করেছিল। আজকের কোন শাসক মারা গেলে কাফিররা উৎসব করবে? বরং এসব শাসকদের কেউ যখন অসুস্থ হয় তখন পশ্চিমারা তার জন্য প্রাইভেট জেট পাঠিয়ে দেয়। তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় ইউরোপের সেরা হাসপাতালে। যেন সুস্থ-সবল করে তাকে আবার মুসলিমদের খুন করতে আর আল্লাহ ﷻ-এর দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠানো যায়।

মুসলিমের রক্তের প্রকৃত মূল্য আমার মনে রাখতে হবে। এটা আমাদের সবার দায়িত্ব। আমাদের জানতে হবে শরীয়াহতে একজন মুসলিমের রক্ত কতটা মূল্যবান। আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসূল ﷺ মুসলিমের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে কী বলেছেন, সেটা জানতে হবে, পরস্পরকে জানাতে হবে।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

[২৭] Kingdom of Navarre

আর যে ইচ্ছাকৃত কোনো মুমিনকে হত্যা করবে, তার প্রতিদান হচ্ছে জাহান্নাম, সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর আল্লাহ তার ওপর ক্রুদ্ধ হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য বিশাল আযাব প্রস্তুত করে রাখবেন। [তরজমা, সূরা আন-নিসা, ৯৩]

হাদিসে এসেছে,

مَن أشارَ إلى أخِيهِ بحَدِيدَةٍ، فإنَّ المَلائِكَةَ تلْعَنُهُ، حتّى يَدَعَهُ

যে তার ভাইদের দিকে কোনো অস্ত্র (লৌহখণ্ড) তাক করে, ফেরেশতাগণ তাকে অভিশাপ দিতে থাকে যতক্ষণ না সে তা (অস্ত্র,লৌহখণ্ড) রেখে দেয়।[২৮]

হাদিসে এসেছে,

لَزوالُ الدُّنيا جميعًا أهونُ عند اللهِ من دمٍ يُسفَكُ بغيرِ حقٍّ

অন্যায়ভাবে একজন মুসলিমকে হত্যা করার তুলনায় পুরো পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহর কাছে কম গুরুতর।[২৯]

কেউ হয়তো প্রশ্ন তুলতে পারেন। যদি মুসলিমের রক্ত আল্লাহ ﷻ-এর কাছে এত দামি হয় তাহলে কেন তিনি কাফিরদের ওপর প্রতিশোধ নেন না? কেন তিনি এই অত্যাচারী, খুনি কাফিরদের শাস্তি দেন না?

এ প্রশ্নের উত্তর হলো, আল্লাহ ﷻ দুনিয়াকে শাস্তির জায়গা হিসেবে তৈরি করেননি; বরং দুনিয়াকে তিনি তৈরি করেছেন পরীক্ষার জায়গা হিসেবে। আর পরিপূর্ণ পুরস্কার ও শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বলেন,

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ

আর কিয়ামাত দিবসে আমি সুবিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব, অতঃপর কারও প্রতি এতটুকুও অন্যায় করা হবে না। কারও কর্ম যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা হাযির করব। আর হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট। [তরজমা, সূরা আল-আম্বিয়া, ৪৭]

যদি কেউ একজন মুসলিমকে হত্যা করার আগে তাঁর গালে চড় দেয়, তাহলে আল্লাহ ﷻ

---

[২৮] সহিহ মুসলিম, ২৬১৬

[২৯] ইবনু মাজাহ, ২৬১৯

তাঁর কাছ থেকে হত্যা এবং চড়, দুটোরই হিসেব নেবেন। যদি কেউ কোনো মুসলিমকে হত্যা করার আগে তাঁকে অপমান করে, তাহলে এই হত্যা এবং অপমান, দুটোর হিসেব মহান আল্লাহ ﷻ-এর সামনে তাকে দিতে হবে।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

আর আখিরাতে আছে কঠিন আযাব এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবনটা তো ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়। [তরজমা, সূরা আল হাদীদ, ২০]

আজ আমরা উম্মাহর ওপর যে নির্যাতন দেখছি, সেটা আমাদের কাছে অসহ্য, অসনীয় মনে হয়ে। কিন্তু আখিরাতের শাস্তির তুলনায় এটা কিছুই না।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ﴿٢٥﴾ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ

অতঃপর সেদিন তাঁর আযাবের মতো আযাব কেউ দিতে পারবে না এবং তাঁর বাঁধনের মতো কেউ বাঁধতে পারবে না। [তরজমা, সূরা আল-ফাজর, ২৫, ২৬]

তিনি ﷻ বলেন,

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

আর যালিমরা যা করছে, আল্লাহকে তুমি সে বিষয়ে মোটেই গাফেল মনে কোরো না, আল্লাহ তো তাদের অবকাশ দিচ্ছেন, ওই দিন পর্যন্ত, যেদিন ভয়ে-আতঙ্কে চোখ পলকহীন তাকিয়ে থাকবে। [তরজমা, সূরা ইব্রাহিম, ৪২]

যে আখিরাতের কথা স্মরণ করে হৃদয়কে শান্ত করবে না, এ দুনিয়ার বাস্তবতা তার হৃদয়কে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলবে।

আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে, মুসলিমের রক্ত অনেক, অনেক দামি। যতই নির্যাতন, ধর্ষণ, হত্যার খবর আসুক না কেন, হতাশ হওয়া যাবে না। অবশ হওয়া যাবে না। মুসলিমের সম্মান এবং তার রক্তের মূল্যের কথা মনে রাখতে হবে। মিডিয়া যতই দেখাক না কেন যে, ওদের সম্মান, ওদের মূল্য আমাদের চেয়ে বেশি, বিভ্রান্ত হওয়া যাবে না।

কাফিরের রক্ত আর আমাদের রক্ত সমান না। মুশরিক আর মুমিনের দাম আল্লাহ ﷻ-এর কাছে এক না। হিসেব কাফির আর তাদের মিডিয়ার ঠিক করে দেয়া মাপকাঠিতে হবে না। হিসেব হবে আল্লাহ ﷻ-এর নির্ধারিত মাপকাঠিতে।

ইসলামের শান্তি বনাম গান্ধীর শান্তি

ইসলাম শান্তির ধর্ম না, এই বক্তব্য নিয়ে বেশ কিছু আপত্তি আমার কাছে এসে পৌঁছেছে। আমার মনে হয় এ আপত্তিগুলো নিয়ে আলোচনা করাটা উপকারী হবে।

প্রথমত, যে পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আমি এ বক্তব্য দিয়েছিলাম সেটা বুঝতে পারলে হয়তো আমার ও আপনাদের মতামত অনেকটা কাছাকাছি চলে আসবে। আমি কথাগুলো বলেছিলাম নিউযিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চে মসজিদে হামলার পর। এ ঘটনার পর বিশ্বজুড়ে কাফিররা ইসলামের ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। এটা ছিল দাওয়াহর এক ঐতিহাসিক সুযোগ।

আমি তখন লক্ষ করলাম, পশ্চিমে থাকা আমাদের অনেক মুসলিম ভাই বলছেন, ইসলাম শান্তির ধর্ম। অ্যামেরিকা থাকাকালে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ অনুষ্ঠানগুলোতেও (Interfaith Dialogue) বিভিন্ন বক্তাকে নিয়মিত এ কথাটা বলতে শুনতাম।

আচ্ছা, আমাকে একটা বিষয় একটু বুঝিয়ে দিন।

ধরুন, পশ্চিমা কিছু খ্রিষ্টানদের জন্য একটা লেকচারের ব্যবস্থা করা হলো। শিরোনাম ঠিক করা হলো, ‘কেন ইসলাম শান্তির ধর্ম?’

এ লেকচারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বোঝানো হলো—ইসলামে শান্তির অর্থ বশ্যতা স্বীকার, দুর্বলতা কিংবা অপমান না; বরং ইসলামের অবস্থান হলো, শান্তির জন্য এমন শক্তির প্রয়োজন, যা শান্তির প্রতিরক্ষা করবে। দুনিয়ার বুকে ফাসাদ সৃষ্টি করা আগ্রাসী শত্রুর সাথে শান্তির স্থাপনের কথা ইসলাম বলে না; বরং এ ধরনের লোকেদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার মাধ্যমেই সত্যিকারের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

অর্থাৎ লেকচারে ইসলামের আলোকে শান্তির সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা দেয়া হবে। পুরো বিষয়টি বিস্তারিত বুঝিয়ে দেয়া হবে।

ব্যাপারটা এভাবে উপস্থাপন করা হলে আমার আপত্তি নেই। যখন ইসলামের আলোকে শান্তির সংজ্ঞা দেয়া হবে এবং পূর্ণাঙ্গ চিত্রটা তাদের সামনে তুলে ধরা হবে, তখন এটা বলতে কোনো বাধা নেই যে, ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলাম যে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়, সেটার সাথেও এই ব্যাখ্যার কোনো সংঘর্ষ নেই।

কিন্তু আসলে কি এমন হয়? পশ্চিমা বিশ্বে অবস্থান করা মুসলিমরা যখন কাফিরদের সামনে ইসলামকে উপস্থাপন করে তখন কি এভাবে বিষয়টা উপস্থাপন করা হয়? ব্যাপারগুলো কি বিস্তারিত বুঝিয়ে বলা হয়? যেসব পরিস্থিতিতে এ ধরনের কথা বলা হয়, সাধারণত সেখানে কি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার সুযোগ থাকে?

না; বরং দেখা যায় 'ইসলাম শান্তির ধর্ম', বলা হচ্ছে, তারপর হয়তো এমন কিছু আয়াত আনা হয় যেখানে শান্তির কথা আছে। কিন্তু যেখানে যুদ্ধের কথা আছে, সেই আয়াতগুলোর কথা বলা হয় না।

একটু চিন্তা করুন। যখন একজন অমুসলিম লোক শুনছে যে ইসলাম শান্তির ধর্ম, তখন তার মনে প্রথম কোন অর্থটা আসছে? 'শান্তি' বলতে সে কী বুঝছে?

আমাদের কথা থেকে শ্রোতা কী বুঝছে, এটা জানা খুবই জরুরি।

বাস্তবতা হলো, তারা যখন শোনে 'শান্তির ধর্ম', তখন তারা ধরে নেয়, ইসলাম হলো এমন একটা ধর্ম, যেখানে কোনো যুদ্ধের বিধান নেই। যেটা নিরীহ, গান্ধীবাদী ধর্ম। যুলুমের মোকাবেলায় এর বিধান হলো অসহযোগ আন্দোলন বা অনশন-জাতীয় কিছু একটা করা। 'শান্তির ধর্ম' কথাটা শোনার পর একজন পশ্চিমা মানুষের মাথায় প্রথমে এ অর্থটাই আসবে। কারণ, আজকের দুনিয়াতে শান্তির এ ব্যাখ্যাটাই খুব জোরেশোরে প্রচার করা হয়। যারা এই বিশ্বব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে, তারা চায় যুলুমের মোকাবেলায় সাধারণ মানুষ অর্থহীন গান্ধীবাদী কাজকর্মে ব্যস্ত থাকুক।

একটা বিষয় বোঝার চেষ্টা করুন। মুসলিমদের সাথে যখন আপনি কথা বলছেন তখন শান্তির অর্থ আলাদা করে ব্যাখ্যা করার দরকার নেই। ইসলাম যে শান্তির ধর্ম সেটা প্রমাণের জন্য, একজন মুসলিমের কাছে আমার ব্যাখ্যা করার দরকার নেই যে ইসলামে শান্তি অর্থ হলো নিরাপত্তা, আখিরাতের মুক্তি এবং জান্নাতে পৌঁছানোর পথ। একজন মুসলিম এটা বোঝে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, একজন কাফির যখন 'শান্তির ধর্ম' কথাটা শুনছে তখন তার মাথায় প্রথম কোন অর্থটা আসছে? সে এ কথা থেকে কী বুঝছে?

ধরুন, ইসলামের ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে কিছু অমুসলিম অল্প সময়ের জন্য মাসজিদে আসল। স্বাভাবিকভাবেই খুব বেশি একটা সময় সে এখানে দেবে না। অল্প কিছু কথা শুনে সে চলে যাবে। সেই খ্রিষ্টান বা নাস্তিক পশ্চিমা লোকটা আপনার কাছ থেকে 'ইসলাম শান্তির ধর্ম' শুনে ফিরে গেল।

কিছুদিন পর অন্য কেউ তাকে এসে বলবে, ওরা তো তোমাকে বলেছে ইসলাম শান্তির ধর্ম, তাই না? কিন্তু এই দেখো কুরআনে কী বলা আছে!' তারপর সে জিহাদ আর ক্বিতালের আয়াতগুলো তাকে দেখাবে।

এমন পরিস্থিতিতে প্রথম লোকটার কী প্রতিক্রিয়া হবে? তার তো এমন মনে করা স্বাভাবিক যে আপনি তার সাথে প্রতারণা করেছেন। তাকে ভুল তথ্য দিয়েছেন এবং নিজের ধর্মের ব্যাপারে সত্য গোপন করেছেন। সে ধরে নেবে সত্যবাদিতার সাথে মানুষকে নিজের ধর্মের দিকে আহ্বান করতে আপনি আগ্রহী না। ইসলাম ও মুসলিমদের ব্যাপারে তখন তার কী ধারণা হবে?

এ কারণেই, ইসলাম শান্তির ধর্ম, এ কথাটাকে দাওয়াহর স্লোগান বানানো উচিত না। কথাটা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ।

অন্যদিকে আপনি যদি বলেন,

'ইসলাম হলো আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের ধর্ম',

অথবা, 'ইসলাম হলো সত্য ও ন্যায়বিচারের ধর্ম',

অথবা, 'সব সৃষ্টির দাসত্ব আর সব মানবরচিত ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করে শুধু এক আল্লাহর আনুগত্য করার ধর্ম',

তাহলে আর এ সমস্যাটা থাকে না।

এ কথাগুলো সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেকোনো সময়ে, যেকোনো পরিস্থিতিতে এ কথাগুলো প্রয়োগ করা সম্ভব। এখানে কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই কোনো বিশদ আলোচনার কিংবা পূর্বশর্তের। তাই স্লোগান হিসেবে এগুলো অনেক বেশি উপযুক্ত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

আমি আমার রাসূলদের সুস্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠিয়েছি আর তাদের সঙ্গে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও (সত্য মিথ্যার) মানদণ্ড, যাতে মানুষ ইনসাফ ও সুবিচারের

ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। [তরজমা, সূরা আল-হাদীদ, ২৫]

অর্থাৎ আল্লাহ ﷻ নবী-রাসূল ﷺ-গণকে প্রেরণ করেছেন, ওয়াহি নাযিল করেছেন ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য। আনুগত্য, ইবাদত ও দ্বীন কেবল আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করার জন্যে। এগুলো ইসলামের মৌলিক লক্ষ্য। এ লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্য কখনো শান্তির প্রয়োজন, কখনো যুদ্ধের। কুরআনে অনেক জায়গাতে শান্তির আহ্বান করতে মানা করা হয়েছে।

যেমন আল্লাহ ﷻ বলেন,

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ

অতএব তোমরা হীনবল হোয়ো না ও শান্তির আহ্বান জানিয়ো না এবং তোমরাই প্রবল। আর আল্লাহ তোমাদের সাথেই রয়েছেন এবং কখনোই তিনি তোমাদের কর্মফল হ্রাস করবেন না। [তরজমা, সূরা মুহাম্মাদ, ৩৫]

কিন্তু সত্য, ন্যায়বিচার এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের ব্যাপারে কখনোই আল্লাহ নিষেধ করেননি। এমন আয়াত আছে যেখানে শান্তির বদলে জিহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এমন কোনো আয়াত কিংবা হাদিস নেই যেখানে আল্লাহর বদলে অন্য কারও ইবাদত করতে বলা হয়েছে, যেখানে সত্যের বদলে মিথ্যার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেখানে ন্যায়বিচারের বদলে দেয়া হয়েছে অন্যায়ের আদেশ। কাজেই আমরা যখন বলি, 'ইসলাম হলো অমুক মূল্যবোধের ধর্ম', তখন সেই মূল্যবোধ ইসলামের সব শিক্ষা ও সব হুকুমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া জরুরি।

তাই আমি আবারও বলছি, 'ইসলাম শান্তির ধর্ম' কথাটা অমুসলিমদের কাছে দাওয়াহর ক্ষেত্রে স্লোগান হিসেবে উপযুক্ত না। বিশেষ যখন বিস্তারিত ব্যাখ্যার সুযোগ থাকে না। এমনকি অধিকাংশের মুসলিমের কাছেও যেহেতু এ বিষয়গুলো আজ পরিষ্কার না, তাই তাঁদের সামনেও এটা স্লোগান হিসেবে উপযুক্ত না। কারণ, এ যুগে শক্তি দিয়ে শক্তির মোকাবিলা আর আগ্রাসনের প্রতিরোধ করার শিক্ষা দেয়ার বদলে, অধিকার অর্জন এবং যুলুম প্রতিরোধের মাধ্যম হিসেবে গান্ধীবাদকে মুসলিমদের মধ্যে প্রমোট করা হয়েছে ব্যাপকভাবে।

আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমার কথার অর্থ এই না যে, শান্তি কাফিরদের একচেটিয়া সম্পত্তি; বরং তাদের শান্তির দাবি মিথ্যা এবং প্রকৃত শান্তি ইসলাম ছাড়া সম্ভব না।

ইসলাম একটি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। ইসলাম আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে এবং আল্লাহই এর হিফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন। একেক সময়ে একেক স্লোগান

আসবে। তারপর আবার চলে যাবে। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য, মানুষের মন জেতার জন্য ইসলামকে এসব স্লোগানের অনুবর্তী হওয়া জরুরি না। এসব স্লোগানের আদলে ইসলামকে ব্যাখ্যা করাও জরুরি না।

বরং আপনি যখন ইসলামকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরবেন তখন বিশুদ্ধ ফিতরাতের অধিকারীরা ইসলামের দিকে আকর্ষিত হবে। যারা নিজের সাথে সত্যবাদী, যাদের ফিতরাহ বিশুদ্ধ, তারা ইসলামের দিকে আগ্রহী হবেই। শান্তি বলতে আজ যে বশ্যতা, নিষ্ক্রিয়তা, দুর্বলতা ও অপমানকে বোঝানো হয় সেটা বরং তাদের ফিতরাতের সাথে সাংঘর্ষিক হবে।

চরমপন্থা এবং জঙ্গীবাদ!

একজন মুসলিমের ব্যক্তিত্ব ও পরিচয় স্বতন্ত্র। সে কাফিরদের অনুকরণ করে না। কাফিরদের বানানো নতুন নতুন ট্রেন্ডে সে গা ভাসায় না। মুসলিম স্রোতের টানে ভেসে আসা খড়কুটো না। সে ঈমানের শক্তিতে বলীয়ান, তাওহিদের পরিচয়ে সুদৃঢ়। সবকিছুতেই সে অন্যদের চেয়ে স্বতন্ত্র। আর তাই যে শব্দগুলো সে ব্যবহার করে, সেগুলোও আলাদা।

কাফের, মুশরিক আর মুনাফিকদের ব্যবহার করা শব্দগুলো মুসলিমদের মুখে উচ্চারিত হতে দেখা খুব দুঃখজনক। শুধু দুঃখজনক না, কাফের মুশরিকদের তৈরি করা পরিভাষাগুলো মিম্বার থেকে হুবহু একইভাবে উচ্চারিত হতে দেখাটা অত্যন্ত কুৎসিত একটা ব্যাপার। এ কুৎসিত ব্যাপারটা আজ আমাদের নিয়মিত দেখতে হচ্ছে।

আমরা প্রায়ই দেখি, বিভিন্ন আলিম অতিথি হিসেবে বিভিন্ন টক-শোতে যান। এসব অনুষ্ঠানে সাধারণত এমন উপস্থাপিকারা থাকে, যারা অনর্গল শুধু মিথ্যাই বলে যায় না বরং নিজেদের দেহগুলোও উন্মুক্ত করে রাখে। সেই সাথে অনুষ্ঠানে আলিমদের পাশাপাশি অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয় এমন-সব লোকদের যাদের অন্তর তাওহিদ ও রিসালাতের প্রতি ঘৃণায় ভরা। আশ্চর্যের ব্যাপারে হলো, সেখানে গিয়ে শাইখরা ওই মানুষগুলোর ভাষাতেই, তাদের সাথে সুর মিলিয়ে 'উগ্রবাদ আর জঙ্গীবাদ' নিয়ে কথা বলেন।

বিশ্বাস করুন, পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে খুব জঘন্য আর কুৎসিত মনে হয়। গা গুলিয়ে ওঠে।

আচ্ছা কাফের, মুশরিক, মুনাফিক আর দুনিয়ার জন্য দ্বীন বিক্রি করা লোকেরা 'উগ্রবাদ' বলতে কী বোঝায়?

এ প্রশ্নের উত্তর কি আমরা জানি না?

আল্লাহর যমীনে আল্লাহর শরীয়াহ কায়েম হোক, এ মাটিতে চূড়ান্ত আইন হোক ইসলামী শরীয়াহ—এই চাওয়াটা ওদের সংজ্ঞা অনুযায়ী উগ্রবাদ।

বিধানদাতা এক আল্লাহ, শাসনকর্তৃত্ব কেবলই আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সার্বভৌম না। সংবিধান, গণতন্ত্র কিংবা আন্তর্জাতিক আইন, যা কিছু আল্লাহর দ্বীনের সাথে সাংঘর্ষিক, তা কোনোভাবেই মেনে নেয়া সম্ভব না—এ কথাগুলো বিশ্বাস করাও তাদের মতে উগ্রবাদ।

অথচ একজন আলিম বা দা'ঈ এমন-সব লোকের মাঝে বসে তাদের সাথে সুর মিলিয়ে এই 'উগ্রবাদের' বিরোধিতা করছেন। নিন্দা জানাচ্ছেন। তারপর আবার এসে বলছেন 'আরে আমি তো উগ্রবাদ বলতে 'দ্বীনের মধ্যে সীমালঙ্ঘনকে বুঝিয়েছি।'...

কতটা কুৎসিত এবং জঘন্য একটা ব্যাপার!

না! এ অজুহাত গ্রহণযোগ্য না। কক্ষনো না। কারণ, আপনি যাই বুঝিয়ে থাকুন না কেন, 'উগ্রবাদ' বলতে তারা কী বোঝায় সেটা তো আপনি জানেন। তারা সাধারণ মানুষের সামনে কোন জিনিসকে উগ্রবাদ হিসেবে তুলে ধরে, সেটাও আপনার জানা। তাহলে আপনি কেন তাদের বুঝের বিরোধিতা করলেন না?

এরাই তো আল্লাহ ﷻ-এর দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে নিজেদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব বানিয়ে নিয়েছে। দ্বীন ইসলামের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধের নাম দিয়েছে 'উগ্রবাদ আর জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'। এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য হলো প্রকৃত ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। প্রকৃত ইসলামের জায়গায় ক্রুসেইডারদের পছন্দমতো কাটছাঁট করা এক গৃহপালিত ইসলাম তৈরি করা।

এসবই তো আপনার জানা। তাহলে কীভাবে আপনি তাদের সাথে বসে একই সুরে, একই ভাষায় কথা বলেন? তাদের সাথে একই নৌকায় ওঠেন?

চরমপন্থা বোঝাতে ইসলামে আমরা 'গ্বূলুহ' শব্দটা ব্যবহার করি। যার অর্থ হলো সীমা অতিক্রম করা। কিন্তু সেটা কোন সীমা? সেটা হলো শরীয়াহর দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সীমা। আন্তর্জাতিক আইনের বেঁধে দেয়া সীমা না। মানুষের বানানো সংবিধানের সীমা না। আল্লাহর শরীয়াহর সীমা অতিক্রম করার নিন্দা আমরা করি। কারণ, এর অর্থ হলো আল্লাহর অবাধ্য হওয়া। আল্লাহ ﷻ এই কাজকে ঘৃণা করেন এবং নিষিদ্ধ করেছেন।

কিন্তু আমাদের অবস্থান হবে ইসলামের আলোকে। কাফির-মুরতাদদের পলিসির আলোকে না। কাফেররা কোনো কিছুকে উগ্রবাদ বললেই আমরা সেটার নিন্দা করি

না। ভালোমন্দ, মধ্যপন্থা, শিথিলতা, উগ্রবাদ—এ সবকিছুর মাপকাঠি হলো আল্লাহর শরীয়াহ। আন্তর্জাতিক আইন না। মানবরচিত সংবিধান না। কাফেরের তৈরি করা সংজ্ঞা না।

আপাত দৃষ্টিতে ছোটখাটো ব্যাপারেও রাসূলুল্লাহ ﷺ আহলুল কিতাব ও মুশরিকদের সাথে পার্থক্য বজায় রাখতে আদেশ দিয়েছেন। বলেছেন তাদের বিপরীত করতে। তাঁকে দেখে ইহুদীরা এমনও বলেছিল যে,

ما يريد هذا الرجل, يقصدون النبي– أن يدَعَ من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه

এই ব্যক্তি (অর্থাৎ নবী ﷺ) কী চায়? সে তো এমন কিছুই বাকি রাখছে না যেখানে সে আমাদের বিরোধিতা করছে না।[৩০]

সেই নবী ﷺ-এর উম্মাহ হয়ে আজ আমরা কী করছি? নবী ﷺ-দের ওয়ারিশ হবার দাবিদারেরা আজ কী করছেন?

কাফির-মুশরিকদের মতো করে শব্দ ব্যবহারের ব্যাপারে সতর্কতা এবং নিষেধাজ্ঞা এসেছে কুরআনেও। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করার সময় 'রাইনা' শব্দটি ব্যবহার করতে আল্লাহ ﷻ আমাদের মানা করেছেন। আরবীতে এর অর্থ হলো 'আমাদের কথা শুনুন'। কিন্তু হিব্রুতে এর অর্থ নেতিবাচক। সাহাবায়ে কেরাম ﷺ 'রাইনা' শব্দটি ব্যবহার করতেন ভালো নিয়্যাতে। কিন্তু ইহুদীরা খারাপ উদ্দেশ্যে শব্দটি ব্যবহার করত। তাই আল্লাহ ﷻ তাঁদের ইহুদীদের বিপরীত করতে বললেন। এবং কুরআনের আয়াত নাযিল করে বললেন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করতে।[৩১]

তাহলে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় কাফেররা আজ যেসব শব্দ ব্যবহার করছে, সেগুলোর ব্যাপারে আমাদের অবস্থান কেমন হওয়া উচিত?

হে মুসলিম, নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখুন। কাফির-মুশরিক আর মুনাফিকদের পাতা ফাঁদের ব্যাপারে সতর্ক হোন। আর যারা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে, কখনো তাদের অনুসরণ করবেন না।

---

[৩০] সহিহ মুসলিম, ৩০২

[৩১] হে মুমিনগণ, তোমরা 'রা'ইনা' বোলো না; বরং বল, 'উনজুরনা' আর শোনো,

বিজয়, আত্মত্যাগ আর সুবিধাবাদের গল্প

কল্পনা করুন, বিশাল প্রাসাদে বন্দী একদল মানুষ। বের হবার দরজা কেবল একটা। সে দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। দরজা খুলতে চাবি লাগবে। প্রাসাদের ভেতরের এক পাশের দেয়ালে দশটা গর্ত। যেকোনো একটায় আছে দরজার চাবি। কোনো গর্তে চাবি আছে সেটা কেউ জানে না।

হিসেব খুব সহজ তাই না?

গর্তগুলো খুঁজে খুঁজে চাবিটা খুঁজে বের করে নিলেই ল্যাঠা চুকে যায়।

হ্যাঁ, হিসেব সোজা। তবে একটা জটিলতা আছে। দশটা গর্তের একটার মধ্যে তো চাবি, কিন্তু বাকি নয়টার মধ্যে আছে বিষাক্ত কালকেউটে সাপ।

সহজ সমীকরণের এ জটিলতার কারণেই বুঝি কেউ সাহস করে আগাচ্ছে না। সবাই বসে আছে নিষ্ক্রিয় হয়ে। কেউ কেউ প্রাসাদের তুলনামূলক আরামদায়ক কোনো কোণা বেছে নিয়ে শুরু করে দিয়েছে বিছানাপাতি গোছানো। বন্দীত্বকেই যেন নিয়তি হিসেবে মেনে নিয়েছে সবাই।

শেষমেশ একজন উঠে দাঁড়াল। চোখে ইস্পাতের দৃঢ়তা। আত্মবিশ্বাসী পায়ে হেঁটে গেল গর্তগুলোর কাছে। একটা গর্ত বেছে নিয়ে ভাবলেশহীন মুখে হাত ঢুকিয়ে দিল...

সাপ ছোবল দিল। মানুষটা মারা গেল প্রায় সাথে সাথে।

উঠে দাঁড়াল আরও একজন। হাতে একটুকরো কাপড় পেঁচিয়ে নিল সতর্কতাস্বরূপ। সযত্নে এড়িয়ে গেল প্রথমজনের বাছাই করা গর্তটা। তারপর বাকি ৯টা থেকে বেছে নিল একটা গর্ত।

কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। [তরজমা, সূরা আল-বাক্বারা, ১০৪]

হাতের ওই টুকরো কাপড়ে তেমন একটা লাভ হলো না।

দ্বিতীয়জনও মারা পড়ল সাপের কামড়ে।

উঠে দাঁড়াল তৃতীয় আরেকজন। তারপর চতুর্থ, তারপর পঞ্চম। প্রত্যেকে সাধ্যমতো চেষ্টা করল সাপের ছোবল থেকে হাত বাঁচানোর। কিন্তু একে একে মারা পড়ল সবাই।

পুরো সময়টা জুড়ে অধিকাংশ মানুষ বসে থাকল নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে। সবার মুক্তির জন্য ওরা যখন একে একে মারা যাচ্ছিল, সেই সময়টা নিষ্ক্রিয় দর্শকরা কাটাচ্ছিল ঠাট্টা আর সমালোচনায়। কেউ ঠাট্টা করল, কেউ গাল দিল বোকা, গাধা, নির্বোধ, আবেগী আর জযবাতি বলে। 'আর যাই হোক চাবি খোঁজার চেষ্টায় বেঘোর প্রাণ দিতে হচ্ছে না', এ তৃপ্তি নিয়ে হাসি হাসি মুখ করে বসে রইল বাকিরা।

একে একে মারা পড়ল নয় জন।

গর্ত বাকি একটা।

হাত বাড়িয়ে শেষ গর্তটা থেকে চাবিটা বের করে আনল দশম জন। ধীর নিশ্চিন্ত পায়ে হেঁটে গিয়ে খুলে দিল প্রাসাদের দরজা। এতক্ষণের নিষ্ক্রিয় দর্শক আর সমালোচকরা তখন আনন্দে আত্মহারা। চারপাশে জড়ো হয়ে কান ফাটানো শব্দে হাততালি দিচ্ছে সবাই। কেউ আবেগে কাঁদছে। হাতে চাবি ধরা মানুষটাকে ভাসিয়ে দিচ্ছে প্রশংসার বন্যায়...

এবার কল্পনার রাজ্য থেকে বেরিয়ে আসুন।

আপনার জন্য একটা প্রশ্ন আছে। বলুন তো এ মুক্তি, এ বিজয় আসলে কে আনল?

এ বিজয় কি দশম ব্যক্তির অবদান? নাকি আগের নয় জনের অবদান আরও বেশি? সবার আগে যে মানুষটা উঠে দাঁড়িয়েছিল, নিঃশঙ্কচিত্তে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছিল সাপের গর্তে, যারা তাঁর পর এসেছিল, তাদের তুলনায় তাঁর অবদান কি বেশি না?

আমাদের কল্পনার প্রাসাদের বন্দী মানুষগুলোর মতোই মুসলিম উম্মাহও আজ বন্দিত্বের সময় পার করছে।

সত্যিকার অর্থে পরাজিত তো সে, ঝুঁকি নেয়ার চেয়ে বন্দী হয়ে জীবন কাটিয়ে দেয়া যার পছন্দনীয়। যে সাপের কামড়ের ভয়ে মুক্তির চেষ্টাই করে না।

কিন্তু যারা নিঃসংকোচে, নির্ভীক চিত্তে উঠে দাঁড়ায়। সব প্রতিকূলতা আর ঝুঁকি সত্ত্বেও মুক্তির জন্য, বিজয়ের জন্য যারা চেষ্টা চালায়। যারা বিজয় দেখে যেতে পারবে না

জেনেও বিজয়ের জন্য আল্লাহ ﷻ-এর রাস্তায় জানমাল সম্পদ উজাড় করে দেয়, তারাই হলো গৌরবের উত্তরসূরি। তাঁরাই উম্মাহর অগ্রবর্তী বাহিনী।

আপনিও এ বাহিনীর সদস্য হতে পারবেন। তবে দুটো শর্ত আছে,

১। এমন কোনো গর্তে হাত দিতে পারবেন না, শরীয়াহ এবং ইতিহাসের শিক্ষা যেগুলোর ব্যাপারে দেখিয়ে দিয়েছে যে সেখানে চাবি নেই।

২। যারা আপনার আগে গেছেন এবং ছোবল খেয়েছেন তাদের অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে হবে। তাঁরা যেখানে শেষ করেছেন শুরু করতে হবে সেখান থেকে। তাঁদের ভুলগুলো এড়িয়ে যেতে হবে। তাঁদের অভিজ্ঞতা গভীরভাবে অধ্যয়ন না করে শুধু সাহস, বীরত্ব ও উত্তম নিয়্যাত নিয়ে এগোলো হবে না। তা না হলে আপনি আবারও ওই গর্তেই দংশিত হবেন যে গর্ত থেকে এর আগে আপনার ভাই ছোবল খেয়েছেন। আর মুমিন এক গর্ত থেকে দুইবার দংশিত হয় না।

যদি এ দুই শর্ত মেনে এগিয়ে যান, তাহলে নিশ্চিত থাকুন, বিজয় আমাদের হবেই।

যেখানে ঈমান আছে, সেখানে হতাশার কোনো সুযোগ নেই।

ইস্তিকামাত সবচেয়ে বড় কারামাত[৩২]

অলৌকিকের প্রতি আমাদের একটা স্বাভাবিক দুর্বলতা কাজ করে। আমরা অনেকেই হয়তো মনে মনে চাই, আমাদের সাথে অলৌকিক কোনো ঘটনা ঘটুক। আমাদের সাথে কোনো কারামাত হোক। এ আকাঙ্ক্ষা আরও তীব্র হয় কঠিন পরীক্ষার সময়।

বিপদের সময় আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটার অর্থ হলো তিনি আমার সাথে আছেন। এটা আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে একটা চিহ্ন—আমরা তো এভাবেই চিন্তা করি। তাই না?

কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যায় যে, আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড় চিহ্ন হলো হিদায়াহ। উলামায়ে কেরাম বলেন, ইসলামের সন্ধান পাওয়া, সীরাতুল মুস্তাক্বীমের ওপর আসতে পারাটাই সবচেয়ে বড় অর্জন।

ফিতনাহর সময় মুমিন চতুর্মুখী আক্রমণের শিকার হয়। জিন ও মানবজাতির শয়তানরা এ সময় তাকে সীরাতুল মুস্তাক্বীম থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা চালিয়ে যায় ক্রমাগত। ক্রমাগত তার সামনে তৈরি করে প্রলোভন।

মহান আল্লাহ ﷻ বলেন,

وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ

এবং শয়তানরা তাদের বন্ধুদের প্ররোচনা দেয়, যাতে তারা তোমাদের সাথে বিবাদ

---

[৩২] কারামত হলো, অসাধারণ কোনো ঘটনা, যা আল্লাহর ইচ্ছায় নবী-রাসূলগণ ﷺ ব্যতীত অন্যান্য নেক বান্দাগণের সাথে তাদের জীবিতাবস্থায় অথবা তাদের মৃত্যুর পর তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য ঘটে থাকে। স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে এ ধরনের ঘটনা ব্যাখ্যা করা যায় না। কোনো নেককার ব্যক্তির কোনো অলৌকিক কর্ম ঘটার অর্থ এ না যে, এটি ব্যক্তির ইচ্ছাধীন বা তার নিজের ক্ষমতা। এর অর্থ হলো একটি বিশেষ ঘটনায় আল্লাহ ﷻ তাকে সম্মানিত করে একটি অলৌকিক চিহ্ন প্রদান করেছেন। অন্য কোনো সময়ে তা নাও দিতে পারেন।

করে... [তরজমা, সূরা আন'আম, ১২১]

চক্রান্ত শুধু মানুষ করে না, বরং শয়তানরা ওদের নিত্যনতুন কৌশল শিখিয়ে দেয়।

আজ পুরো উম্মাহ ফিতনাহর মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। অতিক্রম করছে কঠিন পরীক্ষার এক সময়। আর পরীক্ষার এ মুহূর্তে মুসলিমদের সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্যে মিডিয়া আর প্রপাগ্যান্ডার পেছনে ওরা খরচ করছে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার। সারা বিশ্বজুড়ে আজ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে বিশাল বাজেটের বিভিন্ন থিংক ট্যাংক। যাদের প্রধান উদ্দেশ্য হলো, মানুষকে আল্লাহ ﷻ-এর রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়ার নানান কৌশল খুঁজে বের করা।

আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ওরা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করে।

আল্লাহ ﷻ আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন,

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

যদি তাদের সাধ্যে কুলায় তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই থাকবে, যে পর্যন্ত না তারা তোমাদের তোমাদের দ্বীন হতে ফিরিয়ে না দেয়... [তরজমা, সূরা বাক্বারা, ২১৭]

আর এ কাজে তাদের সাহায্য করে আমাদেরই মধ্যকার কিছু মানুষ। এমন কিছু মানুষ, যারা বেড়ে উঠেছে আমাদেরই মাটিতে। আমাদেরই সাথে। যাদের নাম আমাদের মতো। যারা দেখতে আমাদের মতো। কিন্তু তারা সত্যের সাথে মিথ্যা মেলায় এবং আল্লাহর কালামের অপব্যাখ্যা করে।

একদিকে কাফির ও মুরতাদরা চালায় অস্ত্রের আগ্রাসন। অন্য দিকে চলে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ। সেই সাথে চলতে থাকে সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণ আর আল্লাহর কালামের অপব্যাখ্যা। এ সবকিছুর সাথে আরও যুক্ত হয় উম্মাহর বিভক্তি, অধিকাংশের উপেক্ষা আর শীতনিদ্রা।

এতকিছুর পরও আল্লাহর কিছু বান্দা সিরাতুল মুস্তাকিমের ওপর দৃঢ় থাকেন। আল্লাহর রাস্তায় তারা এগিয়ে যায় নির্ভীক চিত্তে। কোনো বিরোধিতা তাঁদের টলাতে পারে না। কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া তাঁরা করে না। পাহাড়সম দৃঢ়তায় সব প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয় হাসিমুখে। তীব্র দাবদাহের অগ্নিঝরা দিনে স্বপ্ন দেখে প্রশান্তির বৃষ্টির। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাত ঠেলে তাঁরা এগিয়ে যায় নতুন ভোরের আশায়।

চারদিক থেকে আক্রমণ।

চারদিক থেকে চক্রান্ত।

তবু কাফেলা এগিয়ে যায়।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ

...তাদের ষড়যন্ত্র এমন ছিল, যাতে পর্বতও টলে যেত। [তরজমা, সূরা ইবরাহীম, ৪৬]

অন্তরের ঈমানকে টলিয়ে দেয়ার জন্য, ধসিয়ে দেয়ার জন্য তারা পরিকল্পনা করে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় তারা ব্যর্থ হয়। কারণ, আল্লাহর এই বান্দাদের ঈমান পাহাড়ের চেয়েও সুদৃঢ় এবং মজবুত।

শত চক্রান্ত আর প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সত্যের ওপর অটল থাকা। সারা বিশ্বের কুফর শক্তির মুখোমুখি হয়ে নিশঙ্কচিত্তে আল্লাহ ﷻ-এর রাস্তায় এগিয়ে যাওয়া—বলুন তো, এর চেয়ে বড় কারামাত কী হতে পারে? এর চেয়ে বড় আর কোন চিহ্ন হতে পারে?

নিঃসন্দেহে ইস্তিক্বামাত হলো সবচেয়ে বড় কারামাত।

পৃথিবী বদলে গেছে

বিপদের মুখোমুখি হবার পর আমাদের কী করা উচিত? চরম বিপর্যয়ের মুহূর্তগুলো কীভাবে মোকাবিলা করা উচিত একজন মুসলিমের? ইসলাম থেকে এ ব্যাপারে আমরা কী শিক্ষা পাই?

'কেন আমার সাথেই এমন হয়!'

'কেন আল্লাহ আমার সাথে এমন করলেন', আমাদের কি উচিত এ ধরনের চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত থাকা?

না। ইসলাম আমাদের সাবরের শিক্ষা দেয়। ইসলাম আমাদের শেখায় দুঃখকষ্ট, আতঙ্কের মতো নেতিবাচক অনুভূতিগুলোকে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করতে।

'কেন আল্লাহ এমন করলেন', এই প্রশ্নের বদলে ইসলাম আমাদের শেখায় নিজেদের প্রশ্ন করতে—

'এই অন্যায় ও মন্দ প্রতিরোধে এ মুহূর্তে আমার কী করণীয়? আমার কী দায়িত্ব?'

কিন্তু কোনো বিপর্যয়ের পর আজ যখন ইসলামের নির্দেশিত পথে তার মোকাবিলার কথা বলা হয়, তখন আমরা নিচের কথাগুলো আমরা শুনতে পাই :

'পৃথিবীর বাস্তবতা বদলেছে। প্রেক্ষাপট পালটেছে।'

'পরিস্থিতি এখন আর আগের মতো নেই!'

'দলীল, আয়াত হাদীস...এ যুগে এসব কথাবার্তা অচল।'

'এখন সবকিছু বদলে গেছে'...

কয়েক বছর আগে আরব বসন্তের শুরুর সময় শরীয়াহর আলোকে আমরা পরামর্শ

দিয়েছিলাম। আমরা বলেছিলাম, দ্বীনের ব্যাপারে আপোশ না করতে। বলেছিলাম, ইসলামের নুসুস ও শিক্ষার বদলে নিজস্ব ধ্যানধারণা ও খেয়ালখুশিকে প্রাধান্য না দিতে। আমরা বলেছিলাম, যা-ই ঘটুক না কেন, আল্লাহ ﷻ-এর আইন প্রতিষ্ঠার দাবি ও লক্ষ্যকে কোন অবস্থাতেই দূরে ঠেলে দেয়া যাবে না।

তখনো আমাদের ওপরের কথাগুলো শোনানো হয়েছিল। বলা হয়েছিল;

'পৃথিবী বদলে গেছে। এখন ওসব কথা অচল।'

কী বিস্ময়কর কথা! আরব বসন্ত হোক কিংবা শীত, আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসূল ﷺ যা করার নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁরা যে পদ্ধতি দেখিয়ে দিয়েছেন সেটা এখন আমাদের জন্য প্রযোজ্য না?

আচ্ছা, কুরআন-সুন্নাহর বক্তব্য যদি এখন প্রযোজ্য না হয়, তাহলে সেটা কখন প্রযোজ্য হবে? কুরআন-সুন্নাহ, দ্বীনের নুসুস কি আজ আমাদের কাছে তামাদি হয়ে গেছে? এগুলো কি মেয়াদোত্তীর্ণ হবার তারিখসহ নাযিল হয়েছিল যে আমাদের ইচ্ছেমতো আমরা বলে দেব, আজ এগুলো আর প্রযোজ্য না?

একটা কথা এখানে পরিষ্কার করি। আমি বলছি না যে নুসুসের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান ও ব্যাখ্যাকেই গ্রহণ করতে হবে। 'আমার অবস্থান গ্রহণ না করার মানে নুসুসকে গ্রহণ না করা', এটাও আমি বলছি না।

আমি ওইসব মানুষদের কথা বলছি, যারা বলে যে 'অমুক আয়াত, অমুক হাদীস, অমুক বিধান, আজকের যামানার জন্য অনুপযুক্ত'। অথবা 'এগুলো অকার্যকর হয়ে গেছে'।

আমি ওইসব মানুষের কথা বলছি যারা বলে, 'আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন... এসব কথা আমাদের শোনাতে আসবে না। এখন অত কিছু মানা যাবে না'।

এ ধরনের লোকেরা সব পরিস্থিতিতেই কোনো-না-কোনো অজুহাত খুঁজে পাবে কুরআন-সুন্নাহকে উপেক্ষা করার। তাদের এসব কথা আমাকে আল্লাহ ﷻ-এর এই আয়াতগুলো মনে করিয়ে দেয় :

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ ۗ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا
رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ

আর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে আমি তো তোমাকে তাদের রক্ষক হিসেবে পাঠাইনি। বাণী পৌঁছে দেয়াই তোমার দায়িত্ব। আর আমি যখন মানুষকে আমার রহমত আস্বাদন করাই তখন সে খুশি হয়। আর যখন তাদের কৃতকর্মের জন্য

তাদের ওপর কোনো বিপদ আসে তখন মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ হয়। [তরজমা, সূরা আশ-শূরা, ৪৮]

আরব বসন্তের সময় আমাদের সামনে ঐতিহাসিক এক সুযোগ এসেছিল। আমরা আনন্দিত হলাম। উচ্ছ্বসিত হলাম। আর উচ্ছ্বাসের চোটে দ্বীনকে ভুলে গেলাম। অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া। বাস্তবতা, আর রাজনীতির দোহাই দিয়ে আমরা এড়িয়ে যেতে শুরু করলাম দ্বীনের হুকুমগুলো। শুধু তা-ই না, নানানভাবে এই আচরণকে জায়েজ করারও চেষ্টা করলাম। যেন কুরআন বলে কোনো কিছু আমাদের সামনে নেই, সুন্নাহ আমাদের কাছে নেই!

এ সময়টাতে একদিকে আমরা দেখলাম দ্বীনের ব্যাপারের একের পর এক ছাড়, আপসকামিতা, অবহেলা, উপেক্ষা, আর সত্যের সাথে মিথ্যের মিশেল। অন্যদিকে দেখলাম আল্লাহ ﷻ-এর নির্ধারিত সীমার লঙ্ঘন আর গুলুহ।

যারা কুফরে পতিত হয়েছিল তারা যখন কুফরের অন্ধকারে হারিয়ে যাবে, অকৃতজ্ঞতরা যখন অকৃতজ্ঞতায় আর সন্দিহানরা যখন সন্দেহের মাঝে হারাবে, যখন তাদের কর্মফল তাদের সামনে আসবে, তখন তারা বলবে,

هَٰذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

...এটা কোত্থেকে? বলো, 'তা তোমাদের নিজদের থেকে'। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। [তরজমা, সূরা আলে-ইমরান, ১৬৫]

وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ ﴿٩﴾ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي ۚ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ

আর যদি আমি মানুষকে আমার পক্ষ থেকে রহমত আস্বাদন করাই, অতঃপর তার থেকে তা কেড়ে নিই, নিশ্চয় সে তখন (হয়ে পড়বে) নিরাশ, অকৃতজ্ঞ। আর দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করার পর যদি আমি তাকে নিআমত আস্বাদন করাই, তাহলে সে অবশ্যই বলবে, 'আমার থেকে বিপদাপদ দূর হয়ে গেছে, আর সে হবে অতি উৎফুল্ল, অহংকারী। [তরজমা, সূরা হুদ, ৯,১০]

আজ বিপর্যয়ের সময় অবিচলতা থাকে না। স্বাচ্ছন্দ্যের সময় পাওয়া যায় না আনুগত্যে দৃঢ়তা। আর যখন এ ব্যাপারে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, তখন তারা বলে,

'পরিস্থিতি পালটেছে'

'পৃথিবী বদলে গেছে'

আল্লাহ ﷻ বলেন,

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

তবে যারা সাবর করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্যই রয়েছে ক্ষমা ও মহা প্রতিদান। [তরজমা, সূরা হুদ, ১১]

বিপর্যয় দেখা দিলে ভাগ্যকে দোষারোপ করার বদলে আমাদের মনোযোগ দেয়া উচিত করণীয়-এর দিকে। কিন্তু এ কথা বলে আজ কিছু মানুষ বলে ওঠে।

আমাদের ইতিবাচক হবার কথা বলবে না। সেটা কুরআন-হাদিসের কথা হলেও না। কারণ, পরিস্থিতি বদলেছে।

অভ্যস্ত, সর্পিল অপলাপ

সূরা আল-আম্বিয়ার কিছু আয়াত আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। ইব্রাহিম ﷺ যখন মুশরিকদের উপাস্য মূর্তিগুলো ভেঙে ফেললেন তখন তারা এসে তাঁকে বলল:

"হে ইব্রাহিম, তুমিই কি আমাদের প্রভুদের সাথে এসব করেছ?"

তিনি বললেন :

"না তো! বরং সবচেয়ে বড় মূর্তিটাই বাকিদের ভেঙেছে। তাকেই জিজ্ঞেস করো, হয়তো সে বলতে পারবে!"

তারপর কী হলো সেটা লক্ষ করুন।

فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٦٤﴾ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنطِقُونَ

তখন তারা নিজেদের দিকে ফিরে গেল এবং একে অন্যকে বলতে লাগল, 'তোমরাই তো যালিম!' অতঃপর তাদের মাথা অবনত হয়ে গেল এবং বলল, 'তুমি তো জানোই যে, এরা কথা বলতে পারে না।" [তরজমা, সূরা আল-আম্বিয়া, ৬৪-৬৫]

এক মুহূর্তের জন্যে হলেও, তারা বুঝতে পেরেছিল যে তারা ভুল আর ইব্রাহিম ﷺ সঠিক। কয়েকজন তো বাকিদের সামনে সরাসরি সেটা বলেও ফেলেছিল। কিন্তু অল্প কিছুক্ষণ পর ইব্রাহিম ﷺ-এর কাছে ফিরে আসল। তারা কি সত্যকে গ্রহণের জন্য ফিরে এসেছিল?

মোটেই না!

তারা ইব্রাহিম ﷺ-এর কাছে ফিরে গিয়েছিল একগুঁয়ে জেদ নিয়ে। তর্কের জন্য, তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দেয়ার জন্য।

হঠাৎ কী হলো? কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে কী এমন হয়ে গেল? কেন সত্যকে চেনার পরও তারা সেই ভুল পথের পথিকই থেকে গেল?

'তোমরাই তো যালিম', এ কথা বলার পর তাদের মাঝে এমন কী আলোচনা হলো যা তাদের আবার কুফর ও শিরকের দিকে টেনে নিয়ে গেল? কী হয়েছিল এই সময়টুকুতে?

আমার কী মনে হয় জানেন?

কথা...অনেক কথা।

মুখের কথা। চাহনির কথা।

আমার কল্পনায় এমন অনেক কথোপকথন আসে যার কাছাকাছি কিছু হয়তো সেইদিন তারা বলেছিল...

তাদের চোখমুখ সেইদিন হয়তো বলেছিল :

> 'হে লোকসকল, তোমরা কি চাও মানুষ আমাদের ব্যাপারে বলুক, এক তরুণের কথায় অমুক সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তিদের চিন্তাচেতনা আর বিশ্বাস পালটে গেছে? সেই ছেলের সামনে তারা স্বীকার করেছে যে দশকের পর দশক তারা বাতিলের ওপর ছিল? এরপর তোমাদের মানসম্মান কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা একবার ভেবে দেখেছ? লোকজন তোমাদের কোন চোখে দেখবে বুঝতে পারছ তো?'

> 'হে লোকসকল, এই মূর্তিদের দেখাশুনা করে আর তাদের স্তুতি গেয়ে বহুবছর ধরে আমরা রুটি-রুজির ব্যবস্থা করেছি। আজ যদি ইব্রাহিমের কথা মেনে নিই তাহলে আমাদের রোজগারের কী হবে?'

> 'হে অমুক, তুমি কিন্তু এখনো আমার টাকা শোধ করোনি। মনে আছে তো? তোমার চাকরি, তোমার প্রভাব-প্রতিপত্তি সব কিন্তু এই মূর্তির দেখাশোনার সাথে জড়িয়ে আছে। আজ যদি ইব্রাহিমের কথা মেনে নাও তাহলে তোমার অবস্থান কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, চিন্তা করেছ? আর আমার টাকা তখন তুমি কীভাবে শোধ করবে?'

আর এভাবেই হয়তো তারা ডজনখানেক অজুহাত দাঁড় করিয়ে ফেলেছিল সত্যকে অস্বীকার করে নিজেকেদের কুফর আঁকড়ে থাকার জন্যে। এভাবেই হয়তো নিজেদের অপরাধ ধামাচাপা দিয়ে ইব্রাহিম ﷺ-কে দোষী সাব্যস্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ওরা।

আর এভাবেই হয়তো তাদের অন্তরে মুহূর্তের জন্যে জ্বলে ওঠা সত্যের প্রদীপ নিভে গিয়েছিল মিথ্যে অহংকার, লাভ-লোকসানের হিসেবনিকেশ আর ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তার নিকষ অন্ধকারে।

যে মানুষটা বলেছিল, 'তোমরাই তো যালিম', সে-ই হয়তো খানিকপরে চিৎকার করে বলেছিল: 'যদি পুরুষ হও তবে ওকে জ্বালিয়ে দাও, নিজের ভগবানের পাশে দাঁড়াও।'

নিজ অবস্থান থেকে হয়তো সে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছিল, কেবল কওমের সামনে নিজের মান-সম্মান ধরে রাখার জন্যে। তাদের বোঝানোর জন্যে যে, সত্যের যে শিখা দপ করে অন্তরে জ্বলে উঠেছিল, তার লেশমাত্র এখন আর বাকি নেই।

হতভাগ্য এক জাতি! তারা সত্যকে চিনতে পেরেছিল। তারা সুযোগ পেয়েছিল আম্বিয়াগণের পিতা ইব্রাহিম ﷺ-এর অনুসারী হবার। চিরস্থায়ী কল্যাণের ভাগীদার হবার...!

অথচ মুহূর্তের ব্যবধানে তারা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল! আর তাই, আল্লাহ ﷻ তাদের অন্তরগুলোকে পথভ্রষ্ট করে দিলেন। এখন তারা ভয়াবহ যন্ত্রণা ভোগ করে যাচ্ছে বারযাখের জীবনে[৩৩]। আর তারপর তাদের জন্য অপেক্ষা করছে চিরস্থায়ী শাস্তি। আল্লাহ ﷻ বলেন:

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

আর আমি তাদের অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ পালটে দেব যেমন তারা কুরআনের প্রতি প্রথমবার ঈমান আনেনি এবং আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় ঘুরপাক খাওয়া অবস্থায় ছেড়ে দেব। [তরজমা, সূরা আল-আন'আম, ১১০]

সত্য জানার সাথে সাথেই তা স্বীকার করে নিতে হয়। তা না হলে আল্লাহ ﷻ যেকোনো সময়ে অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ পালটে দিতে পারেন। মোহর গেঁথে দিতে পারেন অন্তরে। এমনভাবে অন্তরকে সত্য থেকে ঘুরিয়ে দিতে পারেন, যে সে আর কখনোই সত্যের দেখা পাবে না। আমরা এমন পরিণতি থেকে আল্লাহ ﷻ-এর কাছে আশ্রয় চাই।

দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, সত্যকে এড়িয়ে যাওয়ার এই প্রবণতা কেবল কাফেরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না। কিছু মুসলিমদের মধ্যেও এটা দেখা যায়। এমনকি যারা ইসলামের জন্য কাজ করার দাবি করেন, দ্বীনের কিছু কিছু বিষয়ের ব্যাপারে তাদের মধ্যেও এ

---

[৩৩] বারযাখ : মানুষ মৃত্যু থেকে কিয়ামত দিবসের হিসাব-নিকাশের আগ পর্যন্ত যে মুহূর্ত অতিক্রম করে তা-ই হলো বারযাখ।

ধরনের মনোভাব দেখা যায়। দম্ভ, গর্ব, প্রতিযোগিতা, খ্যাতির মোহ, ভুল স্বীকার করার মতো সৎ সাহসের অভাব, কঠিন পরিণতির ভয় এবং আন্তরিকতার অভাব বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাদের পথে। শত দলিল, প্রমাণ, যুক্তি, তর্কের পরও তারা সত্য স্বীকার করতে চায় না; বরং বিরোধিতা করে। যারা সত্যের দাওয়াত দেয় তাদের পেছনে উঠেপড়ে লাগে।

আর তখনই মানুষকে গ্রাস করে পথভ্রষ্টতা।

হে আল্লাহ, আপনি আমাদের এমন পরিণতি থেকে হেফাযত করুন। আমাদের চালিত করুন সত্যের পথে এবং এ পথে অবিচল রাখুন।

কুরআন কেন আমাদের কাঁদায় না?

সাহাবা ﵃ ও কুরআন পড়তেন আর আমরাও কুরআন পড়ি। কিন্তু তাঁদের ওপর ﵃ কুরআনের যে প্রভাব পড়ত তেমনটা আমাদের মধ্যে দেখা যায় না। কুরআন তাঁদের কাঁদাত, কিন্তু আমাদের চোখ এক ফোঁটা পানিও আসে না।

কুরআন তো সেই একই। তাহলে পার্থক্যটা কোথায়? কেন ফলাফল ভিন্ন?

কারণ, সাহাবী ﵃-গণ যে মানসিক অবস্থা নিয়ে কুরআনের কাছে আসতেন, আমরা সেভাবে আসি না। যে নিয়্যাত নিয়ে তাঁরা ﵃ কুরআন পড়তেন, আমাদের নিয়্যাত সে রকম হয় না।

তাঁরা ﵃ কুরআনের আয়াত শুনতেন নির্দেশের জন্য অপেক্ষমাণ সৈনিকের মানসিকতা নিয়ে। শোনামাত্র পালন করার মনোভাব নিয়ে তাঁরা ﵃ কুরআনের কাছে আসতেন। এ মনোভাব ছিল মহান আল্লাহ ﷻ-এর প্রতি ভালোবাসা, তাঁর রাহমাহর প্রত্যাশা এবং তাঁর শাস্তির ভয়ের ফসল। তাঁরা ﵃ আল্লাহর এই আয়াতের তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন এবং একে বাস্তবায়ন করেছিলেন :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী উক্ত নির্দেশের ভিন্নতা করার কোনো অধিকার রাখে না। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে সে স্পষ্টতই সত্য পথ হতে দূরে সরে পড়ল। [তরজমা, সূরা আল-আহযাব, ৩৬]

আল্লাহ ﷻ-এর আদেশের আনুগত্য করা তাঁদের কাছে কোনো ঐচ্ছিক বিষয় ছিল না। কুরআনের একেকটি আয়াত তাঁদের জন্য ছিল অন্ধকারে পথ দেখানো মশালের

মতো। অধীর আগ্রহে তাঁরা এই আলোর জন্য অপেক্ষা করতেন।

ক্ষরা-আক্রান্ত মাটি যেভাবে বৃষ্টির জন্য প্রতীক্ষা করে, সেইভাবে তাঁরা আল্লাহর কালামের জন্য প্রতীক্ষা করতেন। আর এ কারণেই ঈমানের বীজ থেকে সর্বোত্তম ফসল আসত। তাঁদের সব চিন্তা-ভাবনা, চেষ্টার কেন্দ্রে ছিল একটি প্রশ্ন, কীভাবে আল্লাহর পছন্দমতো তাঁর আদেশ পালন করা যায়?

এই মনোভাব, এই প্রগাঢ় আবেগ ও অনুভূতি নিয়ে যখন কেউ কুরআনের কাছে আসে, তখন প্রথম স্পর্শেই হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায়। কণ্ঠ কাঁপতে শুরু করে আর চোখগুলোতে নামে বৃষ্টি।

এই ছিল সাহাবায়ে কেরাম ﷺ-এর অবস্থা।

আর আমাদের কী অবস্থা?

আসুন নিজেদের সাথে সৎ হয়ে, একটু দেখি।

আমরা কুরআন নিয়ে বসি অলসতা আর নিষ্ক্রিয়তার মনোভাব নিয়ে। কুরআনের আদেশের অনুসরণের বদলে তা থেকে পালানো আর এ দুনিয়ার ক্ষণিকের আনন্দ-উল্লাসে আমাদের পছন্দনীয়। আমাদের অন্তরগুলো সস্তা সুখ আর তামাশায় আসক্ত।

কোনো আয়াতের বক্তব্য যখন আমাদের খেয়ালখুশি, কিংবা কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে যায় তখন আমরা একের পর এক অজুহাত খুঁজি। অজুহাতের প্রাচীর গড়ে আল্লাহ ﷻ-এর আদেশ থেকে দূরে থাকতে চাই।

'হয়তো এ আয়াতের আসল ব্যাখ্যা অন্যরকম',

'হয়তো আপাতভাবে যে অর্থ বোঝা যাচ্ছে সেটা সঠিক না',

'হয়তো এ ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে ইখতিলাফ আছে,

'আরে! আমাদের সময়টাতো সাহাবা ﷺ-গণ সময়ের মতো না',

'আমি এই হুকুমটা পালন করতে পারব না, কিন্তু তাতে কী হয়েছে, আল্লাহ তো পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু'...

আমরা অজুহাতের প্রাচীর গড়ি আর ঈমান থেকে যায় সেই প্রাচীরের বাইরে।

তখন আমাদের অন্তরের গহিন থেকে এক সতর্কবাণী আসে। প্রবৃত্তিকে সতর্ক করে দেয় হৃদয়:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও; যখন সে তোমাদের আহ্বান করে তার প্রতি, যা তোমাদের জীবন দান করে... [তরজমা, সূরা আল-আনফাল, ২৪]

আমরা দ্বিধায় পড়ে যাই। অপরাধবোধে ভুগি। কিন্তু একসময় উপেক্ষা করতে শিখে ফেলি অন্তরের কণ্ঠটাকে। আবার ফিরে যাই অলসতা, নিষ্ক্রিয়তা আর অজুহাতের জগতে।

এই হলো আমাদের অবস্থা।

তাই কুরআন পড়ার সময়ে আমাদের অন্তরে ওইভাবে প্রভাব পড়ে না যেভাবে সাহাবী ﷺ-গণের ওপর পড়ত।

এতে কি আসলে অবাক হবার কিছু আছে?

আপন যদি চান সাহাবী ﷺ-দের মতোই আপনার অন্তরে কুরআনের ছাপ পড়ুক, তাহলে প্রথমে সাহস করে আপনাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আল্লাহ ﷻ-এর হুকুম পালন করা আপনার জন্য কোনো ঐচ্ছিক বিষয় না। অবাধ্য হবার কোনো অপশান আপনার নেই। আল্লাহ ﷻ যা বলেছেন, যেভাবে বলেছেন সেভাবে পালন করতেই হবে।

এ সিদ্ধান্তটা নেয়া সহজ না। কিন্তু আপনি যদি আল্লাহর হিকমাহ ও রাহমাহর ওপর বিশ্বাস রাখেন, তাঁর ওপর তাওয়াক্কুল করেন তাহলে এই কঠিন সিদ্ধান্তটাই নেয়া খুব সহজ হয়ে যাবে। আল্লাহ আপনাকে এমন কিছুর আদেশ দেননি, যা আপনার ক্ষতি করবে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য সহজ করতে চান। তাঁর হুকুমগুলো আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্যই।

আমাদের স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে আল্লাহ ﷻ-এর আনুগত্য করা আবশ্যিক। এখানে অন্য কোনো অপশান আমাদের হাতে নেই। কারণ, আমরা মুসলিম।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী উক্ত নির্দেশের ভিন্নতা করার কোনো অধিকার রাখে না। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে সে স্পষ্টতই সত্য পথ হতে দূরে সরে পড়ল। [তরজমা, সূরা আল-আহযাব, ৩৬]

'আল্লাহ জানেন, তোমরা জানোনা'

কিছু কাজ আছে যেগুলোর ব্যাপার শরীয়াহর অবস্থান অত্যন্ত শক্ত, যদিও আমাদের কাছে ওগুলো অতটা গুরুতর মনে হয় না। যেমন ইসলামের দৃষ্টিতে সুদ এবং মানুষের ওপর ট্যাক্স চাপিয়ে দেয়া, যিনার চেয়ে বড় অপরাধ। এটা হয়তো আমাদের কাছে অনেক সময় অদ্ভুত ঠেকতে পারে। কিন্তু এ কাজগুলোর সামজিক পরিণতি আর কুফলের দিলে তাকালে ইসলামের এ অবস্থানের হিকমাহ কিছুটা হলেও বোঝা যায়।

সুদের কথাই ধরুন।

আজ পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ১% মানুষের মোট সম্পদের পরিমাণ ৬৯০ কোটি মানুষের সম্মিলিত সম্পদের দ্বিগুণের চেয়েও বেশি। মাত্র ২১৫৩ জন বিলিয়েনেয়ারের হাতে আছে ৪৬০ কোটি মানুষের মোট সম্পদের চেয়ে বেশি সম্পদ[৩৪]। সম্পদের এ বৈষম্য বাড়ছে দিন দিন। আর এই তীব্র বৈষম্যের জন্য দায়ী সুদভিত্তিক আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা। সুদকে ব্যবহার করে বিশ্বের শত শত কোটি মানুষকে গোলামে পরিণত করেছে আন্তর্জাতিক বেনিয়ারা। চরম দারিদ্র্যে দিন কাটাচ্ছে শত-কোটি আদমসন্তান। নিপাট স্যুট পরা আধুনিক মহাজনেরা তাদের করেছে লাঞ্ছিত, অপমানিত, কলুষিত। প্রতিনিয়ত পদদলিত হচ্ছে মানবতা। এ সবই হলো সুদের প্রভাব।

নোয়াম চমস্কির 'What Uncle Sam Really Wants' কিংবা জন পারকিন্সের 'Confessions Of An Economic Hitman' বই দুটো পড়লে পাঠক এ ব্যাপারে কিছুটা ধারণা পাবেন।

সুদের এ মারাত্মক প্রভাবগুলো যখন স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন, তখন দেখবেন সুদের ব্যাপারে শরীয়াহর বিধান আপনাকে অবাক করছে না। আল্লাহ ﷻ বলেন,

[৩৪] Time To Care, Oxfam Inequality Report ২০২০

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে, তা পরিত্যাগ করো, যদি তোমরা মুমিন হও। কিন্তু যদি তোমরা তা না করো তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা নাও, আর যদি তোমরা তাওবা করো, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। তোমরা যুলম করবে না এবং তোমাদের যুলম করা হবে না। [তরজমা, সূরা বাকারা, ২৭৮, ২৭৯]

এবং সহিহ সনদে আসা কা'ব ﷺ-এর এই বক্তব্যও আপনাকে অবাক করবে না,

كعب رضي الله عنه: لأن أزني ثلاثا وثلاثين زنية أحب إلي من أن آكل درهم ربا يعلمه الله أني أكلته حين أكلته ربا

আল্লাহ জানছেন আমি সুদ খাচ্ছি—এমন এক দিরহাম সুদ খাওয়ার চেয়ে তেত্রিশ বার ব্যভিচার করা আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়।[৩৫]

একই কথা প্রযোজ্য ট্যাক্সের ক্ষেত্রেও।

আধুনিক সময়ে আমরা ট্যাক্স দেয়াকে দায়িত্ব-জাতীয় কিছু একটা মনে করি। কিন্তু এ ব্যাপারে শরীয়াহর অবস্থান অত্যন্ত কঠোর। আর এ অবস্থানের পেছনে হিকমাহ বুঝতে হলে আমাদের আগে জানতে হবে ট্যাক্সের প্রভাবগুলো নিয়ে।

আমাদের জানতে হবে সেই মানুষগুলোর সম্পর্কে, ট্যাক্সের বোঝা যাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে। যাদের অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেছে। আমাদের জানতে হবে, কীভাবে এক সময়কার সম্মানিত উদার ও দানশীল ব্যক্তিরা এখন দেনাদারে পরিণত হয়েছেন। পালিয়ে বেড়াচ্ছেন পাওনাদারের কাছ থেকে। লজ্জা আর অপমানে দিন কাটছে তাদের পরিবারগুলোর।

এ বাস্তবতাগুলো জানার পর নিচের ঘটনা আমাদের অবাক করবে না।

গ্বামিদি গোত্রের এক নারী যিনা করার পর এক সন্তানের জন্ম দেন। তিনি বারবার স্বেচ্ছায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে নিজের শাস্তি কামনা করেন। একসময় তাঁর শাস্তি কার্যকর হয়। এ নারীর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

---

[৩৫] মুসনাদ আহমাদ, ২১৯৫৮

والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له

ওই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! সে এমন তাওবা করেছে—যদি কোনো ট্যাক্স উসুলকারীও এমন তাওবা করত, তবে তাকেও ক্ষমা করে দেয়া হতো। [৩৬]

গ্বামীদি গোত্রের এ নারী ব্যভিচার করেছিলেন। জারজ সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন যে সারা জীবন লজ্জার বোঝা টেনে বেড়াবে। তবু রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন, এ নারীর তাওবাহ শুধু তার নিজের ব্যভিচারের গুনাহ দূর করার জন্যই যথেষ্ট ছিল না; বরং এর চেয়েও বড় গুনাহ, ট্যাক্স কালেকশনের গুনাহ দূর করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। অর্থাৎ ট্যাক্স কালেক্টরের কাজকে তিনি ﷺ যিনার চেয়েও বড় গুনাহের উদাহরণ হিসেবে এনেছেন।

এভাবে আপাতভাবে অনেক কিছুই আমাদের কাছে অবোধ্য মনে হতে পারে। কারণ হলো পরিপূর্ণ বাস্তবতা আমাদের চোখে পড়ে না। আমাদের জানা নেই এসব কাজের দীর্ঘমেয়াদি ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব। আমরা অতদূরে তাকাইও না। আমরা ব্যস্ত শুধু 'আজ আর এখন' নিয়ে। কিন্তু মানবজাতির স্রষ্টা জানেন কোন পথটি তাঁর বান্দাদের জন্য উত্তম।

আমরা মহান আল্লাহ ﷻ-এর কাছে দু'আ করি, তিনি যেন দুরবস্থায় থাকা তাঁর বান্দাদের জন্য পথ খুলে দেন এবং সংশোধনের সুযোগ দেন।

---

[৩৬] সহিহ মুসলিম, ১৬৯৫; সুনান আবু দাউদ, ৪৪৪২ এবং অন্যান্য

শরীয়াহ নিয়ে ছয়টি ভুল ধারণা

শরীয়াহ নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক ভুল ধারণা কাজ করে। এ ধারণাগুলো দীর্ঘদিনের প্রপাগ্যান্ডা, অপব্যাখ্যা, অজ্ঞতা এবং আংশিক জ্ঞানের ফসল। লম্বা সময় ধরে এসব ভুল ধারণার প্রচার ও প্রসারের জন্য কাজ করেছে ওরিয়েন্টালিস্টরা আর ধর্মনিরপেক্ষতা ও প্রগতির নামে মুসলিমবিশ্বে ইসলামবিদ্বেষ ছড়ানো সুশীলরা। সেই সাথে দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, শরীয়াহর ব্যাপারে অনেক ভুল ধারণার দায়ী আমরা নিজেরাও। ইসলামকে আধুনিক প্রমাণ করতে গিয়ে গত দেড় শ বছরে নানান অপব্যাখ্যা নিয়ে হাজির হয়েছে পশ্চিমা চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত অনেক ব্যক্তি, দল ও সংগঠন। শরীয়াহর পতাকা উচিয়ে তোলার দাবি করা অনেকেই একে বিকৃত করেছে। তারা শরীয়াহর স্লোগানকে ব্যবহার করেছে নিজেদের বৈধতা তৈরির জন্য। তবে অবশ্যই ব্যতিক্রম আছে এবং তা আল্লাহ ﷻ-এর রহমতের কারণেই।

এ বিষয়ে আলোচনা অনেক বিস্তৃত এবং এমন ভুল ধারণাগুলোর সংখ্যা কম না। এ লেখায় এমন কয়েকটি বহুল প্রচলিত ভুল ধারণা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। এ আলোচনার পেছনে প্রথম উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ ﷻ-এর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাতের ইচ্ছে, যখন তাঁর মনোনীত শরীয়াহর ব্যাপারে আমাদের অন্তরে পূর্ণ সন্তুষ্টি থাকবে। আমাদের অন্তরগুলো হবে সব ধরনের সংশয় ও সন্দেহ থেকে মুক্ত।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো শরীয়াহর চেতনা, শরীয়াহর প্রতি ভালোবাসা, শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার দায়িত্বের কথা ছড়িয়ে দেয়া। এটি আল্লাহর যমীনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার একটি আবশ্যিক শর্ত।

শরীয়াহর বিকল্প আসলে কী? শরীয়াহ না থাকার অর্থ কী?

শরীয়াহর বিকল্প হলো জাহিলিয়্যাহ। শরীয়াহ না থাকার অর্থ হলো জাহিলিয়্যাহ—অন্ধকার, অজ্ঞতা। সব অর্থে, সব দিক দিয়ে।

আজ আমরা নব্য জাহিলিয়্যাহর সময়ে বসবাস করছি। চারদিক থেকে আমাদের ঘিরে রেখেছে অন্ধকার আর অজ্ঞতা। জাহিলিয়্যাহর উন্মাদনা আমাদের ভুলিয়ে রেখেছে আল্লাহ ﷻ-এর মনোনীত শরীয়াহর কথা। জাহিলিয়্যাহ আমাদের শরীয়াহর পথ থেকে বিচ্যুত করেছে এবং আমাদের ওপর প্রতিষ্ঠা করেছে যুলুম আর কুফরের শাসন।

তাহলে আসুন শরীয়াহ নিয়ে বহুল প্রচলিত কিছু ভুল ধারণা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

ভুল ধারণা : ১

শরীয়াহকে ঐচ্ছিক বিষয় মনে করা।

কেউ কেউ মনে করেন শরীয়াহ গ্রহণ না করেও মুসলিম থাকা সম্ভব। এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা; বরং শরীয়াহকে গ্রহণ করা এবং আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন শরীয়াহ অনুযায়ী পরিচালনা করা ঈমানের দাবি। এটি দ্বীনের একটি মৌলিক নীতি। শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করতেই হবে এবং শরীয়াহ ছাড়া অন্য সব ব্যবস্থা বাতিল। যে এ কথা বিশ্বাস করে না তার পক্ষে মুসলিম থাকাই সম্ভব না।

আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের মীমাংসার ভার তোমার ওপর ন্যস্ত না করে, অতঃপর তোমার ফয়সালার ব্যাপারে তাদের মনে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ না থাকে, আর তারা তার সামনে নিজেদের পূর্ণরূপে সমর্পণ করে। [তরজমা, সূরা আন-নিসা, ৬৫]

এবং তিনি ﷻ বলেছেন,

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

মু'মিনদের যখন তাদের মাঝে ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয়, তখন মু'মিনদের জবাব তো এই হয় যে, তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম, আর তারাই সফলকাম। [তরজমা, সূরা আন-নূর, ৫১]

এবং তিনি ﷻ বলেন,

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

তারা কি তবে জাহিলিয়্যাতের বিধান চায়? আর নিশ্চিত বিশ্বাসী কওমের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক উত্তম? [তরজমা, সূরা আল-মা'ইদা, ৫০]

এবং,

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

অতঃপর (হে নবী) আমি তোমাকে দ্বীনের (সঠিক) পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি, কাজেই তুমি তারই অনুসরণ করো, আর যারা জানে না তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ কোরো না। [তরজমা, সূরা আল-জাসিয়া, ১৮]

ইসলামী শরীয়াহ ব্যাতীত অন্য কোনো শাসনব্যবস্থা, কোনো তন্ত্রমন্ত্র গ্রহণ করার সুযোগ নেই। শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যিক। এ কথা প্রত্যেক মুসলিমকে বিশ্বাস করতে হবে। এ কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস না করলে, আল্লাহ যমীনে আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের আকাঙ্ক্ষা না থাকলে ঈমানদারই হওয়া যাবে না।

এটা হলো মৌলিক শর্ত। চিন্তা শুরু করতে হবে এই ধাপ থেকে।

এই ধাপে আসার পর বিভিন্ন ইজতিহাদি বিষয়ে ভিন্নমতের সুযোগ আছে। কিন্তু সেই ভিন্নমতের ভিত্তি হতে হবে শরীয়াহ। অর্থাৎ আমরা সবাই শরীয়াহ অনুসরণ করে আল্লাহ ﷻ-কে সন্তুষ্ট করতে চাই। আমরা সবাই এই সন্তুষ্টি অর্জনের সর্বোত্তম পথটা খুঁজছি, যাতে করে তাঁর ইচ্ছে ও নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে পারি—এই অবস্থানের আসার পর পথ ও পদ্ধতি নিয়ে ভিন্নমত হতে পারে।

এমন অনেক দল ও আন্দোলন আছে, যারা শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার দাবিকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে। তারা শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার স্লোগান তোলে কিন্তু তাতে আন্তরিকতা থাকে না। এ ধরনের কোনো দলের বিরোধিতা করা আর শরীয়াহর বিরোধিতা করা, দুটো ভিন্ন বিষয়। শরীয়াহর ব্যাপারে ভুল ইজতিহাদ ত্যাগ করা এক বিষয়, আর আর শরীয়াহর কর্তৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করা আরেক বিষয়। কিন্তু আজ এ নিয়ে অনেকেই বিভ্রান্তিতে ভোগেন। প্রথমটি করা সঠিক। কিন্তু দ্বিতীয়টি, অর্থাৎ শরীয়াহর কর্তৃত্বকে অস্বীকার করা হলো কুফর।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো মানুষ এ দুটি বিষয়কে আজ হরহামেশাই মিলিয়ে ফেলে। যার ফলে তৈরি হয় অনেক বিভ্রান্তি।

ভুল ধারণা : ২

শরীয়াহকে আজকের যুগের জন্য অপ্রতুল, অপর্যাপ্ত কিংবা অ-পরিপূর্ণ মনে করা। এমন মনে করা যে শরীয়াহর অন্য কিছুর প্রয়োজন আছে।

আজ অনেকেই মনে করেন শরীয়াহ শাসন দিয়ে বর্তমান সময়ের চাহিদা মেটানো যাবে না। অনেকে বিশ্বাস করেন পরিপূর্ণভাবে শরীয়াহ অনুসরণ করা আজ সম্ভব না। আধুনিক সময়ে রাষ্ট্র শরীয়াহ দিয়ে চলবে, এ চিন্তাটাই অনেকের কাছে অবাস্তব। তারা মনে করে শরীয়াহ যুগের চাহিদা মেটাতে অক্ষম। কেউ কেউ এটা সরাসরি বলে ফেলে। আর কেউ কেউ এ চিন্তাগুলো প্রকাশ করে নানান প্রশ্নের মোড়কে।

এ ধরনের মানুষদের অনেকেই মনে করেন শরীয়াহতে অসম্পূর্ণতা আর কমতি আছে। আর এগুলো মেটানোর জন্য গণতন্ত্রের মতো আদর্শগুলো থেকে কিছু কিছু জিনিস ধার করা দরকার।

নিঃসন্দেহে এটা একটা মারাত্মক ভুল ধারণা।

এই ভুল ধারণার পেছনে বড় একটা কারণ হলো আমাদের আজকের বাস্তবতা। আজ আমরা এমন একটা সিস্টেমের অধীনে থাকি, যা ইসলামের দৃষ্টিতে পুরোপুরি অবৈধ। অবৈধ এ সিস্টেমের প্রভাব আমাদের জীবনে পড়ে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঢুকে পড়ে বিভিন্ন ক্ষতিকর, হারাম বিষয়। হারামের সাথে সহাবস্থানে আমরা অভ্যস্ত হয়ে যাই।

ইসলাম নিয়ে আমাদের আলোচনার বিশাল একটা অংশ বরাদ্দ থাকে আমাদের জীবনে জোর ঢুকে পড়া এই হারাম বিষয়গুলো নিয়ে।

'অমুক জিনিস কি হারাম?

'কেন হারাম?'

'আচ্ছা এই হারামের বিকল্প কীভাবে তৈরি করা যায়?'

'আচ্ছা অল্প কিছুটা হারাম কি মেনে নেয়া যায় না?'

আমাদের চিন্তা আটকে থাকে এমন নানান প্রশ্নের গোলকধাঁধায়।

অথচ শরীয়াহর ব্যাপ্তি কিন্তু শুধু হারাম-হালাল নির্ধারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ না; বরং শরীয়াহর উদ্দেশ্য হলো এমন এক বাস্তবতা তৈরি করা, যেখানে এই হারামগুলো এবং সেগুলোর প্রয়োজনই থাকবে না। কিন্তু শরীয়াহর পরিপূর্ণ ছবিটা আজ আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। সেটা নিয়ে আলোচনা করার, বোঝার, ভাবার ফুরসত হয় না আমাদের। কালেভদ্রে আমরা এ নিয়ে কথা বলি। তাই আজ অনেকেই শরীয়াহ বলতে বোঝেন নিছক কিছু বাধানিষেধ, আর শাস্তিকে। বিয়ে, তালাক, উত্তরাধিকার, ইত্যাদির মতো অল্প কিছু ক্ষেত্রে আমাদের শরীয়াহর কথা মনে পড়ে। অথচ শরীয়াহ একটি পূর্ণাঙ্গ, পরিপূর্ণ ব্যবস্থা। কুরআন, সুন্নাহ, খালিফাহগণের আমল, ইসলামী শাসনের হাজার বছরের ইতিহাস এবং আলিমগণের ইস্তিমবাতে[৩৭] যে গভীর ও বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়, তার দিকে তাকালে যে কেউ বিস্মিত হয়ে যাবে।

কীভাবে আহলুল হাল্লি ওয়াল আক্বদ এবং শাসক নির্বাচন করা হবে তার বাস্তবসম্মত পদ্ধতি শরীয়াহতে দেয়া আছে। শাসকও যেমন-তেমন হলে হবে না। এমন শাসক হতে হবে যে, মানুষের কাছে গৃহীত হবে এবং ইসলামী আইন অনুযায়ী সাধারণ মুসলিমদের প্রতি তাঁর চুক্তি অনুযায়ী আমল করতে বাধ্য থাকবে।

শরীয়াহ সুদকে নিষিদ্ধ করছে এবং বিভিন্ন ধরনের অংশীদারীকে হালাল করেছে। শারীয়াতে (ডিউটি, ট্যাক্স) হারাম করা হয়েছে। অন্যদিকে খারাজ, উশর, ওয়াকফ ইত্যাদি থেকে অর্থায়নের পদ্ধতি দেয়া হয়েছে।

শরীয়াহতে মালিকানার ব্যাপারে বিস্তারিত নির্দেশনা এসেছে। পানি, জ্বালানি এবং চারণভূমির জনমালিকানার (public ownership) কথা এসেছে।

শরীয়াহতে একচেটিয়া ব্যবসা (মনোপলি) আর দলবেঁধে লুটপাট করার পুঁজিবাদের (ক্রোনি ক্যাপিটালিযম) উত্থানের পথ বন্ধ করার উপায় বলে দেয়া হয়েছে। শরীয়াহতে নির্দেশিত হয়েছে যুদ্ধ ও শান্তি-বিষয়ক কূটনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূলনীতি।

শরীয়াহ আমাদের শিক্ষা দিয়েছে দুর্বল এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্তদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়ার, যদিও তারা কাফির হয়।

কিন্তু আমরা এগুলো নিয়ে কথা বলি না। আসলে শরীয়াহতে কত বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা দেয়া আছে সেটা আমাদের অধিকাংশেরই অজানা।

শরীয়াহ আমাদের এ কাজগুলো করার শিক্ষা দেয় আখিরাতের জন্য। শরীয়াহ আমাদের

---

[৩৭] কুরআন-সুন্নাহর দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে শরীয়াহর ব্যবহারিক বিধান নির্গত করা।

দেয় ইবাদতের এক পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা, যা দুনিয়াবি কোনো ব্যবস্থায় পাওয়া যায় না। নিজের সাথে সৎ হয়ে শরীয়াহর এ বিস্তৃতি ও বিধানগুলোর দিকে তাকালে যে কেউ আল্লাহ ﷻ-এর এই আয়াতের যথার্থতা ও গভীরতা অনুধাবন করবে,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নিআমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে। [তরজমা, সূরা মা'ইদা, ৩]

আমাদের এক সমৃদ্ধ, স্বয়ংসম্পূর্ণ ভান্ডার আছে। কিন্তু আমরা সেটা ভুলে বসে আছি। সেটা ফেলে সমাধান খুঁজছি নানা তন্ত্রমন্ত্রে। শরীয়াহ নিয়ে এবং শরীয়াহর এ দিকগুলো নিয়ে আজ কথা বলা হয় না। স্কুলে এগুলো পড়ানো হয় না; বরং স্কুলে শিশুদের জাহিলিয়্যাহর শিক্ষা দেয়া হয়। অথচ শরীয়াহ থেকে উৎসারিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ানো হয় এবং তা থেকে তারা উপকৃতও হয়।

শরীয়াহ বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছে, সমাধান দিয়েছে। সেই সাথে অবিচার বন্ধ করা এবং নির্দেশনা দেয়ার জন্যে সীমাও ঠিক করে দেয়া হয়েছে শরীয়াহতে। প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে রাখা হয়েছে ইজতিহাদের জায়গাও।

আল্লাহ ﷻ এর এ আয়াত নিয়ে একটু চিন্তা করে দেখুন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

আর আমি তোমার ওপর কিতাব নাযিল করেছি প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়াত, রহমত ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ। [তরজমা, সূরা আন-নাহল, ৮৯]

আল্লাহ ﷻ বলছেন যে, তিনি প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা নাযিল করেছেন। তাহলে এটা কী করে সম্ভব যে, আল্লাহ ﷻ আমাদের যথাযথ রাজনৈতিক ব্যবস্থা দেননি? এটা কী করে সম্ভব যে, তিনি আমাদের জন্য এমন কোনো ব্যবস্থা ঠিক করে দেননি, যা মানুষের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে?

এট কি আদৌ হতে পারে?

এ বিষয়ে আরও আলোচনার জন্য আগ্রহী পাঠকরা নিচের বইগুলো দেখতে পারেন। শরীয়াহর অনন্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেশ কিছু উপকারী আলোচনার জন্য দেখতে পারেন মাকাসিদ আশ-শরীয়াহ নিয়ে ইবনু আশুর ؒ এর বই। এ ছাড়া এমন আলোচনা আছে

আল্লাল আল-ফাসি ﵀-এর মাক্বাসিদ আশ-শরীয়াহ ওয়া মাকারিমুহা গ্রন্থে। শরীয়াহর রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ইতিহাস নিয়ে চমৎকার আলোচনা পাবেন ড. হাকিম আল-মুতা'ইরির লেখাতেও। যেমন তার গ্রন্থ মাইলস্টোন্স অফ দা গাইডেড স্টেট।

শরীয়াহ অনুসরণ করা, বাস্তবায়ন করা আমাদের ওপর আবশ্যিক। কিন্তু এটা আল্লাহ ﷻ- এর রাহমাহ যে, কেবল বিশ্বাস আর মহান আল্লাহ ﷻ-এর বড়ত্বের ওপর নির্ভর করে শরীয়াহর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয়ার মতো অবস্থায় তিনি আমাদের রাখেননি; বরং শরীয়াহর সৌন্দর্য ও কার্যকারিতা তিনি আমাদের সামনে স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন। আমাদের দেখিয়েছেন এ ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব ও উপকারিতা। শরীয়াহ নিছক তত্ত্ব হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং রাজত্ব করেছে বাস্তবতা হিসেবে। আর এ শরীয়াহ তো তত্ত্ব হবার জন্য নাযিলও হয়নি। নবুওয়্যাতের যুগ, খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসন, সালাফ সালেহিনের সময়ে এবং তারপর হাজার বছরের বেশি সময় ধরে শরীয়াহর সাফল্যের উদাহরণ আমাদের সামনে আছে।

এ ক্ষেত্রে খুলাফায়ে রাশেদীনের ইতিহাস নিয়ে ড. আলি আস-সাল্লাবির বইগুলো দ্রষ্টব্য। এ বইগুলো পড়লে পাঠক বুঝতে পারবেন, শরীয়াহ শাসনের অধীনে থাকা কীভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। কীভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বয়ে আনে রাহমাহর স্পর্শ। তবে বলাই বাহুল্য এ নিয়ে আরও অনেক গবেষণা, পরীক্ষা ও বাস্তবায়নের কাজ পড়ে আছে।

ভুল ধারণা : ৩

শরীয়াহ, আর শরীয়াহর প্রয়োগে ভুল বা বিচ্যুতির মধ্যে পার্থক্য বুঝতে না পারা।

মুসলিম শাসকদের ভুল বা বিচ্যুতির অনেক উদাহরণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। সমস্যা হলো আমরা অনেকেই ধরে নিই, এই ভুলগুলোর উৎস বা কারণ হলো শরীয়াহ। অথবা আমরা ধরে নিই, এই ভুল বা বিচ্যুতিগুলো ঠেকানোর কোনো ব্যবস্থা শরীয়াহতে নেই।

যেমন আমরা ধরে নিই, শরীয়াহ শাসনের ক্ষেত্রে শাসক যুলুম করতে পারে।

ইতিহাসে এমন আমরা এমন অনেক শাসক দেখেছি, যারা মোটাদাগে, সামগ্রিকভাবে শরীয়াহ দিয়ে শাসন করেছেন। মুসলিমদের স্বার্থ এবং সম্মান রক্ষা করেছেন, মুসলিমদের শত্রুদের তটস্থ করেছেন এবং জিহাদের মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিমদের ভূমি বিস্তৃত করেছেন। কিন্তু তাদের এসব অবদান সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন

যুলুমের অভিযোগ আছে।

সমস্যা হলো, আমরা ধরে নিচ্ছি এই যুলুম শরীয়াহ শাসনের ফলাফল। কিন্তু আসলে এগুলো হলো শরীয়াহ থেকে তাদের বিচ্যুতির ফল।

এ ধরনের শাসকদের ব্যাপারে আমাদের আচরণ কেমন হবে?

শরীয়াহ আমাদের ভারসাম্য রক্ষা করতে বলে।

একদিকে মুসলিমদের ঐক্য রক্ষা, শত্রুদের মোকাবিলায় শক্তি মজবুত রাখা জরুরি। অন্যদিকে শাসকের যুলুমের সমর্থন না করা, একে অনুমোদন না দেয়া, তাদের আগ্রাসনের নিন্দা করা এবং আগ্রাসন ও যুলুম থেকে তাদের বিরত রাখার চেষ্টা করাও জরুরি।

শরীয়াহ আমাদের এ দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য করার শিক্ষা দেয়।

এ তো গেল ওই শাসকদের কথা, যারা সামগ্রিকভাবে ইসলাম দিয়ে শাসন করা সত্ত্বে বিভিন্ন সময় যুলুম করছেন।

অন্যদিকে আজ আমরা যেসব স্বৈরাচারী শাসক দেখি, তাদের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্কই নেই। এই শাসকেরা বরং শরীয়াহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ক্রুসেইডার ও যায়োনিস্টদের সাথে হাত মিলিয়েছে এবং ইসলামের নাম ও নিশানা মিটিয়ে দিতে চাচ্ছে। এদের অনুগত দরবারি কিছু আলিম আছে। শাসকদের গদি রক্ষার জন্যে এই দরবারি আলিমরা সাধারণ মানুষের সামনে কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা তুলে ধরে। শরীয়াহর বিভিন্ন দলীলকে আউট অফ কন্টেক্সট ও বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে। ক্ষমতার গোলামি করা এই আলিমরা ইসলামের অপব্যাখ্যা করে আজকের শাসকদের বৈধতা তৈরি করতে চায়।

এর প্রতিক্রিয়ায় দেখা যায়, কিছু মানুষ স্বৈরাচারী শাসকদের কার্যকলাপ আর আগেকার মুসলিম শাসকদের যুলুমের উদাহরণ টেনে এনে শরীয়াহর ওপর দোষারোপ করে। আর সমাধান হিসেবে বলে গণতন্ত্রের কথা।

কিন্তু শাসকের একনায়কতন্ত্র এবং স্বেচ্ছাচার শরীয়াহতে বৈধ না। শরীয়াহর সাথে এর কোনো সম্পর্কও নেই; বরং মুসলিম হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো শরীয়াহর নির্দেশিত পন্থায় এর প্রতিবাদ করা এবং শাসককে যুলুম থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা।

আর শাসকের যুলুম শুধু শরীয়াহ শাসনের ক্ষেত্রে হয় না। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রসহ সব ধরনের শাসন ব্যবস্থায় এটা হয়ে থাকে; বরং যে ব্যবস্থার কথা বলে আজ শরীয়াহর

সমালোচনা করা হয়, সেখানে যুলুম হয় আরও বেশি। সারা দুনিয়ার নব্বই শতাংশের বেশি সম্পদ আজ অল্প কিছু মানুষ আর কর্পোরেশানের হাতে কুক্ষিগত হয়ে আছে। এটা হলো পুঁজিবাদের ফলাফল। এর চেয়ে বড় যুলুম আর কী হতে পারে? এই অল্প কিছু লোক নিয়ন্ত্রণ করছে দুনিয়ার সব বড় বড় মিডিয়া। প্রপাগ্যান্ডার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ব্রেইনওয়াশ করছে। নিজেদের ইচ্ছেমতো জনমত তৈরি করে দিয়ে লাগিয়ে দিচ্ছে যুদ্ধের আগুন। সাধারণ মানুষের লাশের ওপর দাঁড়িয়ে টাকা গুনছে অস্ত্র বিক্রেতা, তেল কোম্পানি আর মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো। মিডিয়া আর পপ কালচারের মাধ্যমে ওরা উস্কে দিচ্ছে অনৈতিকতা, অধঃপতন এবং পশুর মতো যৌনতা। ধ্বংস করছে মানুষের দুনিয়া আর আখিরাতকে।

কীভাবে এই সীমাহীন যুলুম আল্লাহ ﷻ-এর নাযিল করা হিদায়াতের বিকল্প হতে পারে?

ভুল ধারণা : ৪

শরীয়াহতে দুনিয়াবি বিষয়গুলোকে তেমন গুরুত্ব দেয়া হয় না। তাই শরীয়াহর অধীনে দৈনন্দিন জীবন অনেক কঠিন হয়ে যাবে।

আমরা প্রায়ই অনেককে বলতে শুনি—লোকেরা যতদিন শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার দাবি না তুলে কেবল দুনিয়াবি বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকবে ততদিন তাদের অবস্থার উন্নতি হবে না।

সাধারণ মানুষ যে মনে করে শরীয়াহতে দুনিয়াবি বিষয়গুলো গুরুত্ব দেয়া হয় না, তার পেছনে এ ধরনের কথার একটা বড় ভূমিকা আছে।

শরীয়াহ অথবা দুনিয়া, বিষয়টাকে এভাবে উপস্থাপন করা উচিত না। মহান আল্লাহ ﷻ এভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করেননি। এ ধরনের বক্তব্যের কারণে মানুষ ভাবতে শুরু করে যে শরীয়াহ শাসন দিয়ে মুসলিমদের বর্তমান অবস্থা কিংবা জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা সম্ভব না। আর এমন অবস্থায় , সুন্দর জীবনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে হাজির হয় আল্লাহর শত্রুরা। স্বাভাবিকভাবেই অনেক মুসলিম তখন তাদের ফাঁদে পা দেয়।

আল্লাহর শরীয়াহ উদ্দেশ্য কি মানুষকে দুনিয়ার শাসকদের গোলামি থেকে মুক্ত করা না? মানুষের প্রয়োজনগুলো পূর্ণ করা, তাদের সম্পদ লুট হওয়া থেকে রক্ষা করার মাধ্যমে তাদের স্বীয় রবের ইবাদতে মনোনিবেশের সুযোগ দেয়া কি শরীয়াহর উদ্দেশ্য না? শরীয়াহ কি দুনিয়াবি জীবনের সংকীর্ণতা ও যুলুম থেকে মুক্ত করে মানুষকে আখিরাতের প্রাচুর্য ও বিশালতার সাথে যুক্ত করে দেয় না?

যেমনটা সাহাবী রিবি' ইবনু আমর ﵁ বলেছিলেন—

> আল্লাহ আমাদের পাঠিয়েছেন, মানুষকে সৃষ্টির দাসত্ব থেকে স্রষ্টার দাসত্বে নিয়ে আসতে। সমস্ত বাতিল ধর্মের জুলুম থেকে মানুষকে মুক্ত করে দ্বীন ইসলামের ইনসাফের দিকে আনতে। এবং দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে দুনিয়া ও আখিরাতের প্রশস্ততার দিকে নিয়ে যেতে।[৩৮]

ভুল ধারণা : ৫

শরীয়াহকে সামগ্রিকভাবে না দেখে কেবল রাষ্ট্রীয় শাসনের সাথে সম্পর্কিত মনে করা।

অনেকে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটা এমনভাবে উপস্থাপন করেন যেন এটা কেবল রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কিছু পরিবর্তনের ব্যাপার। অল্প কিছু পদ্ধতি বদলে নিয়ে কিছু অদল-বদল করলেই শরীয়াহ শাসন প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, যে কলুষিত জীবনব্যবস্থার অধীনে আমরা বর্তমানে আছি, শরীয়াহর কাজ হলো একে আমূল বদলে দিয়ে ইসলামের ভিত্তির ওপর আমাদের জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করা। যেন পুঁজিবাদ, ভোগবাদ, বস্তুবাদের মোহ আমাদের মধ্যে আর না থাকে। যাতে যন্ত্রের মতো কেবল লাভ-লোকসান আর কার্যকারণের হিসেব কষতে কষতে আমাদের জীবন কেটে না যায়। কারণ, শরীয়াহ একটি স্বতন্ত্র এবং নিখুঁত ব্যবস্থা। এটি এমন এক প্রাসাদ, যার কোনো মেরামতের কিংবা সংস্কারের প্রয়োজন নেই। এই প্রাসাদ কোনো ত্রুটিপূর্ণ ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠেনি।

ভুল ধারণা : ৬

শত্রুর মুখোমুখি হবার আশঙ্কায় শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বাদ দেয়া।

শরীয়াহ ব্যাপারে ব্যাপকভাবে প্রচলিত আরেকটি ভুল ধারণা হলো, আজকের বিশ্বব্যবস্থা কোনোভাবেই শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করতে দেবে না। তারা সর্বশক্তি দিয়ে এর বিরোধিতা করবে। তাই এ চেষ্টা বাদ দেয়াই ভালো। কাফিরদের মোকাবিলা করা সম্ভব না। আমরা বরং অন্য কোনো উপায়ে মুসলিমদের স্বাধীন আর মুক্ত করার চেষ্টায় মনোযোগ দিই।

---

[৩৮] ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭/৪৩-৪৪

যারা এমনটা মনে করেন তাদের বলছি—হে আমার ভাই, শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করার মানে হলো, এই বিশ্বব্যবস্থার গোলামি থেকে মুক্তি। আজ পৃথিবীর কোনো অঞ্চলে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠিত হবার তাৎপর্য কেমন হবে জানেন?

মনে করুন, পৃথিবীর সব মানুষ বিশাল বিশাল জেলখানায় বন্দী। এমন অবস্থায় সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে ভয়ংকর জেল ভেঙে একসাথে কয়েক কোটি মানুষ বেরিয়ে গেল। বাকিদের ওপর এর প্রভাব কেমন হবে? এটা বাকি বন্দীদের উজ্জীবিত করবে। তাদের উদ্বুদ্ধ করবে গোলামির শেকল ছিঁড়ে ফেলতে।

আজকে শরীয়াহর প্রতিষ্ঠা পুরো পৃথিবীর মানুষের জন্য এমনই এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। যারা গোলামির বাস্তবতাকে এখনো চেনেনি, তারাও তখন বুঝতে পারবে কীভাবে পুঁজিবাদ তাদের গোলাম বানিয়ে রেখেছে।

হ্যাঁ, এ মুক্তির দাম চড়া। এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই চড়া দামের ভয়ে জীবনভর শরীয়াহর বিকল্প খুঁজে বেড়িয়ে কোন লাভ হবে না। এ বিকল্পগুলো হলো কারাগারের অলিগলিতে বন্দীর নিষ্ফল ঘোরাঘুরির মতো। এসব করে অল্প কিছু সময়ের জন্য সূর্যের আলো দেখা যাবে, হয়তো পাওয়া যাবে দু-এক মুঠো ভালো খাবারের সন্ধান কিংবা মিলবে ঠান্ডা পানির খোঁজ। কিন্তু বন্দিত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

কিন্তু শরীয়াহর তরবারির আঘাতে যখন কারাগারের শিক ভেঙে ফেলা হবে, তখনই আসবে সত্যিকারের মর্যাদা, সম্মান, মুক্তি।

দশকের পর দশক গোলামির শেকল বয়ে চলা উম্মাহ কি রক্তের দাম না মিটিয়েই মুক্তি পাবে? আদৌ কি তা সম্ভব? লড়াই, আঘাত আর আত্মত্যাগ ছাড়া কি বন্দী কখনো অন্ধকূপ থেকে বেরোতে পারে? লোহার শিক ভাঙতে গেলে হাতে ব্যথা লাগা স্বাভাবিক। এ দাম যে চুকাতেই হবে। কিন্তু এই দাম, এই যখম, এই রক্তের বিনিময়ে আমরা কী পাচ্ছি?

দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মান এবং সঠিক পথের দিশা।

সেই মুক্তির পথ ও পদ্ধতি কী হবে, সেটা একটা ভিন্ন আলোচনা। হয়তো আগামীতে সেই আলোচনার সুযোগ হবে। তবে আমার এই আলোচনার মূল লক্ষ্য ছিল দুটি বিষয়ে পাঠকের সামনে স্পষ্ট করা,

১) এমন কোনো আদর্শ অনুসরণ না করা, যা শরীয়াহর গুরুত্ব অস্বীকার করে, অথবা শরীয়াহকে বর্তমানে অপ্রাসঙ্গিক মনে করে। আর এর দ্বারা আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

২) কারাগারের অলিগলিতে সময় নষ্ট না করে, সব সময়, শক্তি আর প্রচেষ্টা ওই পথে উজাড় করে দিতে হবে, যে পথ আমাদের রবকে সন্তুষ্ট করে।

মহান আল্লাহ ﷻ বলেন,

وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

...যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ তার অন্তরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। [তরজমা, সূরা আত-তাগাবুন, ১১]

ঘুম, ঘোর, অবহেলা

তারুণ্য হলো তীব্র উৎসাহ, প্রাণশক্তি, শারীরিক সক্ষমতা আর পরিষ্কার চিন্তার সময়। কিন্তু আমরা আমাদের তারুণ্যটা কীভাবে কাটাই?

এই অমূল্য সময়টা আমরা কাটিয়ে দিই তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তর্ক করে। আড্ডা দিয়ে। অর্থহীন বিষয়ের পেছনে ছুটে। একবার গুরুত্বহীন বিষয়ের খাদে পড়ে, তারপর আবার সেখান থেকে বের হবার পেছনে।

এ সময়টাতে আমরা যদি দৃষ্টি অবনত করা আর নজরের হেফাযতের ব্যাপারে গড়িমসি করি, পরিপূর্ণভাবে পর্দা করা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগি, ফাজরের সালাতে উঠতে হিমশিম খাই, নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশা এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অবহেলা করি, তাহলে কীভাবে হবে? আমরা যদি সব সময় নষ্ট করি টিভি, গান, সিরিয়াল, সিনেমার পেছনে—তাহলে কীভাবে হবে?

জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা সময় যদি এ চক্রে আটকে থেকেই আমরা পার করে দিই তাহলে কীভাবে আমরা আল্লাহ ﷻ-এর দ্বীনের জন্য কাজ করব? কীভাবে আমরা নিজেদের এমন অবস্থানে নিয়ে যাব যাতে করে আল্লাহ ﷻ-এর নৈকট্য অর্জন করতে পারি?

আমাদের তারুণ্য যদি এভাবেই কেটে যায়, তাহলে উম্মাহকে নিয়ে কখন আমরা চিন্তা করব? কখন উম্মাহর দেহে জমা অপমানের ধুলো ঝেড়ে ফেলব? ডুবন্ত এ উম্মাহকে কে বাঁচাবে? যদি আমরা নিজেরাই ডুবন্ত হই?

কখন আমরা নিজেদের গুছিয়ে নেব? কখন নিজেদের অন্তরের ঈমানের সুমিষ্টতা অনুভব করব? আর কখন আমরা অন্যদের এই সুমিষ্টতার দিকে আহ্বান করব?

কখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে গুনাহ করার তরুণদের আমরা মসজিদে নিয়ে আসব?

আমাদের সমাজে আমাদের সাথে বাস করা বিধর্মীদের কখন আমরা তাওহিদের দিকে আহ্বান করব, যাতে বিচারের দিন মহান আল্লাহ ﷻ-এর সামনে ওরা আমাদের দোষী সাব্যস্ত না করতে পারে?

কখন আমরা ইসলামের আদর্শ ও ইতিহাস সম্পর্কে জানব? কখন নিজের পরিবার ও পরিসরে এ আদর্শ ছড়িয়ে দেব? কখন উম্মাহর পুনরুত্থানের জন্য কাজ করব?

কখন আমরা জাগব আর এই ঘুণেধরা সমাজটাকে জাগাব? এই দ্বীনের এ বিরুদ্ধে চলা ওই চক্রান্তগুলোর ব্যাপারে কখন আমরা মানুষকে সতর্ক করব? যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

তারা তোমাদের সাথে লড়াই করতে থাকবে, যতক্ষণ না তোমাদের দীন থেকে তোমাদের ফিরিয়ে দেয়, তারা যদি পারে... [তরজমা, সূরা আল-বাক্বারা, ২১৭]

কখন আমরা অন্যদের এক্সপেরিমেন্টের গিনিপিগ হবার বদলে নিজেরা উদ্যোগ নেব? স্রোতের টানে ভেসে চলার বদলে কখন আমরা পরিবর্তনের সূচনা করব?

কখন আমরা উম্মাহ ও মানবজাতির প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালন করব? যে দায়িত্বের ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত, মানবজাতির (সর্বাত্মক কল্যাণের) জন্য তোমাদের আবির্ভূত করা হয়েছে, তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করো ও আল্লাহর প্রতি ঈমান রক্ষা করে চলো... [তরজমা, সূরা আলে-ইমরান, ১১০]

এখনো কি সময় আসেনি আল্লাহ ﷻ-এর এই হুকুমের জবাব দেয়ার?

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ

হে মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হও...। [তরজমা, সূরা আস-সাফ, ১৪]

যথেষ্ট হয়েছে! কেটে গেছে দ্বিধাদ্বন্দ্বের অনেক মুহূর্ত, অনেক হয়েছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পথচলা। অনেক হয়েছে গোলকধাঁধায় চক্রাকারে ঘুরে মরা।

আসুন, আমরা জাগি। আসুন আমরা উঠে দাঁড়াই। আসুন আল্লাহর দ্বীনের জন্য কাজ করি। আল্লাহর দ্বীনের পথে এগিয়ে যাই এবং রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য অর্জন করি।

প্রবৃত্তির হাতছানি

আমরা যারা ইসলাম মেনে চলার চেষ্টা করি, তাঁদের মধ্যে প্রায়ই একটা বিষয় দেখা যায়। গান শোনা বা নারী-পুরুষের হারাম সম্পর্কের মতো অনেক অভ্যাস আমরা ছেড়ে আসি, দাড়ি রাখা, হিজাবের মতো বাহ্যিক কিছু আমলও আমাদের মাঝে দেখা যায়। কিন্তু সত্যিকারের পরিশুদ্ধির পর্যায় পার হয়ে না আসার কারণে, আমাদের প্রবৃত্তি আমাদের সাথে থেকে যায়। কিছুদিন মুখ লুকিয়ে থাকার পর আবার হাজির হয়ে নিষিদ্ধ কাজের দিকে সে আমাদের তীব্রভাবে আকর্ষণ করতে থাকে।

প্রবৃত্তির যে অংশটুকু এতদিন আমাদের টেনে নিয়ে যেত পরিচিত গুনাহগুলোর দিকে, সেই অংশটুকুই এখন ফাঁক-ফোকর খুঁজতে থাকে দ্বীন পালনের মাঝে ক্রটির সৃষ্টির জন্যে। যার কারণে অনেক ক্ষেত্রে ইসলাম পালনের অর্থ হয়ে দাঁড়ায় অন্তঃসারশূন্য বাহ্যিক আমল।

অন্তরের গহিনে সুপ্তাবস্থায় থাকা গুনাহের প্রতি এই আকর্ষণ প্রকাশ পেতে পারে বিভিন্নভাবে। কেউ আগে নিজ প্রবৃত্তিকে তৃপ্ত করত গান শুনে বা বিভিন্ন নিষিদ্ধ জিনিস দেখে। আজ সে হয়তো প্রবৃত্তিকে তৃপ্ত করছে লোক-দেখানো আমল ও দ্বীনকে খ্যাতি অর্জনের জন্যে ব্যবহার করে। অথবা সে হয়তো নিজেকে ইসলামের রক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক ধরে নিয়ে বেপরোয়াভাবে অন্যের গীবত করছে, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছে। কিংবা সে হয়তো অন্যের হক নষ্ট করছে। দ্বীনের কাজের জন্য মানুষের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে। নিজেকে বোঝাচ্ছে ‘এ টাকা তো আমি ইসলামের জন্যই খরচ করব, তাই এর আসল হক্বদার তো আমিই।’ অথচ দিনশেষে সেই অর্থ সে নিজের কাছে ব্যয় করছে কিংবা অপচয় করছে।

যে বোনটি একসময় দুনিয়াবাসীর সামনে নিজেকে উন্মুক্ত করে প্রবৃত্তির খোরাক জোগাত, আজ সে হিজাব করা শুরু করেছে ঠিকই, কিন্তু আঁটসাঁট পোশাক, আকর্ষণীয় সাজগোজ আর গাইর-মাহরামদের সাথে মেলামেশা করে এখনো প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে

তাঁর প্রবৃত্তিকেই।

সমস্যাটা হলো, এ ধরনের বিষয়গুলো ঘটার সময় মানুষ নিজের বিবেককে অবশ করে রাখে। বিবেক তাকে জাগানোর চেষ্টা করে, কিন্তু সে তাকে দমন করতে থাকে নানানভাবে। নিজেকে বোঝায়, 'আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যে কি আমি কম করেছি? গান শোনা, অশ্লীল জিনিস দেখা, কত কী ছেড়েছি! আমি আমার দাড়ি বড় করেছি। সমাজের টিটকারি, অপমান সহ্য করেছি। এ সবকিছু তো আমি আল্লাহর জন্যেই করেছি। আমি ঠিক পথেই আছি। আমি হক্কের ওপরেই আছি।'

হ্যাঁ, সে আল্লাহর জন্যই কাজগুলো করেছে। তবে প্রবৃত্তির তাড়না থেকে সে এখনো মুক্ত হতে পারেনি। তাই যা ছেড়ে এসেছে তা পুষিয়ে নেয়ার নতুন নতুন পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে তার প্রবৃত্তি।

খারেজিদের অবস্থার কথা চিন্তা করুন, যাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন,

يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاَتَكُمْ مع صَلاَتِهِمْ، وصِيامَكُمْ مع صِيامِهِمْ، وعَمَلَكُمْ مع عَمَلِهِمْ، ويَقْرَؤُونَ القُرْآنَ لا يُجاوِزُ حَناجِرَهُمْ، يمرقونَ من الدينِ كما يمرقُ السَّهْمُ من الرمِيَّةِ

তোমাদের মাঝে এমন একদল লোক আবির্ভূত হবে, তাদের সালাতের সামনে এবং তাদের সিয়ামের সামনে তোমরা নিজেদের সালাত-সিয়ামকে তুচ্ছ করে দেখবে। তারা কুরআন তিলাওয়াত করবে, কিন্তু তাদের কুরআন তাদের কণ্ঠনালি অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে যেভাবে ধনুক থেকে তির বের হয়। [৩৯]

বাহ্যিকভাবে খারেজিদের ইবাদত, আমল ছিল সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم-এর চেয়ে বেশি। কিন্তু তারা তাদের প্রবৃত্তির তাড়না থেকে মুক্ত হতে পারেনি। ইসলামে আসার পরও তাদের মধ্যে শেকড় গেড়েছিল প্রাক্তন প্রবৃত্তির অংশ। আর এটাই ছিল তাদের গোমরাহির কারণ।

ইবনু কাসীর رحمه الله বলেন,

ইসলামের প্রথম বিদ'আত ছিল খাওয়ারিজের ফিতনা এবং এর সূত্রপাত হয়েছিল দুনিয়াবি কারণে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হুনাইনের যুদ্ধের গানীমাহ বণ্টন করছিলেন, তখন তাদের কলুষিত চিন্তার কারণে তারা ধরে নিয়েছিল, রাসূল ﷺ গানীমাহ বণ্টনের ব্যাপারে ইনসাফ করছিলেন না।

---

[৩৯] সহিহ বুখারি, ৫০৫৮

তাদের মধ্য থেকে এসময় যুল খুওয়াইসিরাহ নামের ব্যক্তি বলেছিল,

"হে মুহাম্মদ, আপনি আল্লাহকে ভয় করুন ও ইনসাফ করুন।"[৪০]

এই হলো তাদের গোমরাহির অবস্থা। আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে তারা বলেছিল ইনসাফ করতে!

তাদের অনেক নেক আমল ছিল, ছিল ইবাদতের আধিক্য। কিন্তু তাদের অন্তরগুলো পরিশুদ্ধির স্তর পার করেনি। পাহাড়-প্রমাণ ইবাদত-বন্দেগী করার পরও তারা মুক্ত হতে পারেনি প্রবৃত্তির তাড়না থেকে। প্রবৃত্তির টানে তারা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে তারা অন্য মুসলিমদের চেয়ে উত্তম। তারা বাকিদের ঊর্ধ্বে। আর তাই মুসলিমদের রক্ত ও সম্পদ হালাল বানিয়ে নিয়েছিল তারা। তারা সত্য থেকে বিচ্যুত হয়েছিল নিজ প্রবৃত্তির তাড়না ঝেড়ে না ফেলার কারণে। কারণ, যারা সত্যের খোঁজ করেন এবং আল্লাহ ﷻ-এর প্রতি আন্তরিকভাবে অনুগত থাকে তাদেরকে আল্লাহ ﷻ কখনোই গোমরাহ করেন না।

প্রিয় পাঠক, আসুন আমরা নিজের অবস্থা ভালো করে যাচাই করে দেখি। আমরা কি আসলেই আমাদের প্রবৃত্তির হাতছানি থেকে মুক্ত হতে পেরেছি? নাকি ছেড়ে আসা জীবনের প্রবৃত্তি এখনো নিয়ন্ত্রণ করছে আমাদের? মনে রাখবেন, পরিপূর্ণভাবে অতীতের তাড়নাগুলো ঝেড়ে না ফেলা পর্যন্ত আমরা সত্যের ওপর দৃঢ় হতে পারব না। নিজেকে ভেঙে আবার গড়তে হবে। আল্লাহর ক্ষমাশীলতার ওপর ভরসা রাখুন, জেনে রাখুন যা কিছু আপনি আল্লাহর জন্যে ত্যাগ করছেন তাঁর বিনিময়ে তিনি আপনার অন্তরে ঢেলে দেবেন প্রশান্তি ও ঈমানের সুমিষ্ট স্বাদ, যে স্বাদ আস্বাদন করেছিলেন মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবী ﷺ-গণ।

كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ

...এদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা তাদের শক্তিশালী করেছেন।... [তরজমা, সূরা আল-হাদীদ, ২২]

---

[৪০] 'একলোক রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে জেরানা নামক স্থানে দেখা করেন। জেরানা নামক স্থানটি হলো সেই জায়গা, যেখানে রাসূল মুহাম্মদ ﷺ হুনায়নের যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমতের মাল বণ্টন করছিলেন। সাহাবী বিলাল ﷺ-এর কাপড়ের ওপর রুপার টুকরোগুলো রাখা ছিল। নবীজি ﷺ সেখান থেকে মুষ্টিবদ্ধভাবে মানুষকে দান করছিলেন। তখন উপস্থিত ওই লোক বলল, "হে মুহাম্মদ, আপনি আল্লাহকে ভয় করুন ও ইনসাফ করুন'। সহিহ বুখারী, ৩৩৪৪।

জরুরি অবস্থা

মুসলিম উম্মাহ আজ এক কঠিন পরীক্ষার সময় অতিক্রম করছে। এটা আমাদের দীর্ঘদিনের বাস্তবতা। উম্মাহর এ অবস্থা নিয়ে মোটাদাগে দু-ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায়। একদল ঘুমন্ত। উম্মাহর অবস্থা নিয়ে হয় তারা বেখেয়াল, অথবা এ অবস্থান বদলানোর জন্য যে কিছু করা দরকার, সেটা তারা মনে করে না। তাদের চিন্তা শুধু নিজেদের ছোট্ট জগৎটা নিয়ে। এই ইচ্ছেঘুম কবে ভাঙবে, কিংবা আদৌ ভাঙবে কি না, আমার জানা নেই।

আরেকদল উম্মাহর অবস্থা পরিবর্তনে কাজ করছেন। উম্মাহর উত্তরণের জন্য আজ পৃথিবীর যে প্রান্তে যা-ই হচ্ছে, সেটা এই মানুষগুলোর হাত দিয়েই হচ্ছে। তবে ঘুমন্ত মানুষ আর কর্মী মানুষের মাঝে আরেকটা দল আছে। তারা ঘুমন্ত নন, কিন্তু তারা কর্মীও নন। আমার কথা মাঝখানের এই দলটা নিয়ে।

তৃতীয় দলের মানুষগুলো উম্মাহর অবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন। কিন্তু এই উদ্বেগ তাদের কাজের দিকে নিয়ে যায় না; বরং তাদের চিন্তাভাবনা স্থায়ীভাবে যেন আটকে যায় 'জরুরি অবস্থায়'। কোনো দীর্ঘমেয়াদি কাজে তারা মন দিতে পারেন না। দিনগুলো কেটে যেতে থাকে ঘোরের মাঝে। কী করছেন, কী করবেন বুঝে উঠতে পারেন না। প্রতিমুহূর্তে চোখের সামনে আসতে থাকা যন্ত্রণাদায়ক খবরগুলো তাদের ভাবাতে থাকে,

> 'খুব দ্রুত কিছু একটা করতে হবে'
>
> 'এই অবস্থা সহ্য করার মতো না'
>
> 'বিপদ খুব কাছে'
>
> 'এই তো! এরপরই আসবে আমাদের পালা...'

ভার্সিটিতে ভর্তি হবার পর মনে হয় ক্লাস আর পড়াশোনাতে পেছনে কেবল সময় নষ্ট হচ্ছে। কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। শুধু শুধু সময় অপচয়। আবার যখন ইসলামি কোনো কোর্স করা শুরু করেন অথবা সন্তান লালন করা নিয়ে কোনো বই পড়েন তখনো মনে হয়, এসব করতে গিয়ে তারা উম্মাহর প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। নিজের বাচ্চাদের সাথে খেলার সময়ও মনে হতে থাকে, তারা যেন পৃথিবীর প্রান্তে ধ্বংসস্তূপে পড়ে কাতরাতে থাকা মুসলিম শিশুদের সাথে প্রতারণা করছেন।

এসব কারণে বেশির ভাগ সময়ে তারা নিজেদের কাজে মন দিতে পারেন না। অপরাধবোধ লাঘবের জন্যই বোধহয় অনেক সময় খরচ করেন খবর পড়া আর দেখার পেছনে। যদিও শুধু খবর দেখায় মনের অপরাধবোধ লাঘব হয় না, আর উম্মাহর অবস্থারও উন্নতি হয় না। মুসলিমদের বিরুদ্ধে চলা অপরাধগুলোর দৃশ্য টিভি পর্দায় দেখে তারা আফসোস করেন। উত্তেজিত হন। ক্রুদ্ধ হন। আর তারপর...

তারপর কিছুই হয় না। কিছুই না। উদ্বেগ ও অনুভূতি তাদের এর চেয়ে বেশি এগিয়ে নিতে পারে না।

মানসিকভাবে তারা যেন স্থায়ীভাবে আটকা পড়ে যান এক 'জরুরি অবস্থায়'। এ মনোভাব প্রকাশ পায় বাবা-মা, স্ত্রী, সন্তান এবং অন্য মানুষের সাথে আচরণে। পড়াশোনা কিংবা কর্মক্ষেত্রে মন দিতে না পারার কারণে খুব একটা সফলতা আসে না। এমনকি দ্বীনের ব্যাপারে এবং রাব্বুল আলামীনের সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখতেও হিমশিম খেয়ে যান অনেকে। কখনোই প্রাণবন্ত বা কর্মচঞ্চল হতে পারেন না। এমনকি তাদের মনোভাব আচরণে দেখে অনেক মানুষ দ্বীন পালনের ব্যাপারে ভুল মেসেজ পায়। দিশেহারা মানসিক অবস্থার কারণে সমাজে তেমন গুরুত্ব দেয়া হয় না তাদের। এমনকি নিজ পরিবারেও তেমন একটা প্রভাব থাকে না।

অন্যদিকে তাদের নিষ্ক্রিয়তার কারণে তৈরি হওয়া শূন্যস্থান পূরণে এগিয়ে আসে এমন-সব মানুষ, যারা হয় বিভ্রান্ত অথবা সম্পূর্ণ ভুল পথের পথিক। এদের অনেকে মুসলিম উম্মাহর জন্যে আজ যে বিষয়গুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যেমন : তাওহিদ আল-হাকিমিয়্যাহ এবং আল ওয়ালা বারা নিয়ে হয় বেখবর অথবা বিভ্রান্ত। এমনকি তাদের অনেকের তাক্বদির, রিসালাত এবং কুরআন নিয়েও সঠিক ধারণা নেই। অনেকে আবার গণতন্ত্র, সেক্যুলারিযম আর লিবারেল ব্যবস্থার অনুসারী বনে পরিণত হয়েছে কুফরি বিশ্বব্যবস্থার আদর্শিক সৈনিকে। দুনিয়াবি সাফল্যের পুঁজিতে এরাই মুসলিম সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব আর রোলমডেল গণ্য হয়। অন্যদিকে জরুরি অবস্থার মানসিকতায় আটকা পড়া মানুষগুলোকে নির্ভর করতে হয় এসব বিভ্রান্ত কিংবা গাদ্দার লোকদের

ওপর। মুসলিম সন্তানেরা তাদের লেখা বই পড়ে বড় হয়, তাদের তৈরি জিনিসের অনুকরণ করে, তাদের ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

হ্যাঁ, আমাদের অবশ্যই উম্মাহকে নিয়ে ভাবতে হবে। ঈমানদারদের অন্তর উম্মাহর বর্তমানকে নিয়ে ব্যথিত হবে, উদ্বিগ্ন হবে, এটাই স্বাভাবিক। এটাই উম্মাহর পুনর্জাগরণের জন্য কাজ শুরু করার প্রথম ধাপ। কিন্তু এই উদ্বেগকে, এই বিষাদকে উদ্যমেও পরিণত করতে হবে। এটাও উম্মাহর প্রতি আমাদের দায়িত্ব। অন্তরে জমানো বিষাদকে চালিকাশক্তিতে পরিণত করতে হবে।

এই উদ্বেগ, এই কষ্ট যেন আমাদের অবহেলাকে দায়িত্ববোধে পরিণত করে। আপনি যে বিষয়েই পড়াশোনা করুন না কেন, সেটাকেই ইসলামের জন্যে কাজে লাগানোর নিয়্যাত রাখুন। যতটুকু সামর্থ্য আছে তা নিয়ে ইসলামের জন্য কী করা যায়, চিন্তা করুন। আপনার প্রতিটি কাজ, প্রতিটি পদক্ষেপ, নিপীড়িত মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে একটুকরো হাসি, তাদের জন্যে অন্তরের কোণে থাকা দুঃখবোধ, সবকিছুর আগে নিজের নিয়্যাতকে যাচাই করুন এবং আল্লাহ ﷻ-এর কাছে পুরস্কারের আশা রাখুন। নিজ সন্তানদের সাথে সময় দিন, খেলা করুন। তাদের হক আদায় করার জন্যে, সুস্থ মানসিক বিকাশের জন্যে এবং তাদের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করার জন্যে।

মনে রাখুন, আমাদের লড়াই একদিনের না। আমরা এক লম্বা যুদ্ধের মধ্যে আছি। এর জন্যে প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, কৌশল, হিসেবী পদক্ষেপ এবং ধৈর্য। আর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ধীরস্থির, ভারসাম্যপূর্ণ মানসিকতা।

কাজেই 'জরুরি অবস্থা'য় আটকে থেকে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকবেন না। নিজের সময় ও সুযোগগুলো নষ্ট করবেন না।

শত্রুরা তাদের চেষ্টা চালিয়ে যাবে। তারা চেষ্টা করবে আপনাকে ধ্বংস করার, আপনার পথ বন্ধ করে দেয়ার। তারা চেষ্টা করবে একের পর এক বাধা আর বিপত্তি তৈরি করার, যাতে আপনার মনে হতাশা সৃষ্টি হয়। যেন আপনি হাল ছেড়ে দেন। কারণ, এতে শুধু আপনার ক্ষতি হবে না, ক্ষতিগ্রস্ত হবে উম্মাহও।

কিন্তু তাদের এ সুযোগ দেয়া চলবে না; ধৈর্য ধরুন, অবিচল থাকুন। দেখবেন তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবে। একসময় তাদের ষড়যন্ত্রও ফলাফলও আমাদের অনুকূলে চলে আসবে।

মহান আল্লাহ ﷻ বলেন,

فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ

...তারা তো তা ব্যয় করবে। অতঃপর এটি তাদের ওপর আক্ষেপের কারণ হবে এরপর তারা পরাজিত হবে...! [সূরা আল আনফাল, ৩৬]

আর তাহলে বি'ইযনিল্লাহ আপনিও হবেন সেই প্রতিশ্রুত বিজয়ের অংশ।

আল্লাহ বলেন :

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

আল্লাহ নিজ কর্ম সম্পাদনে প্রবল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না...। [সূরা ইউসুফ, ২১]

সুতরাং নিজ ভিত্তিকে মজবুত করুন। নিষ্ক্রিয়তা থেকে বের হয়ে আসুন। এ দ্বীন নিষ্ক্রিয়তার না। এ পথ তাত্ত্বিকতার না।

অনুশোচনার দিন

আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছে, যারা মনে করে তাদের ঈমান শক্ত। দ্বীনের ওপর তাদের অবস্থান স্থিতিশীল। কিন্তু বাস্তবতা ধারণার সাথে মেলে না। তাদের হৃদয়গুলো বিনয়াবনত না। ইবাদাতে তাদের অনীহা। ইলম অর্জনে আগ্রহ নেই। ইসলামের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাওয়া লোকেদের ব্যাপারে তারা নিষ্ক্রিয়। দ্বীনের জন্য কাজ করার কোনো উদ্যোগ নেই তাদের। মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকার ব্যাপারেও উদাসীন। তাদের অনেকে দৃষ্টির হেফাযত করে না। হিজাব পালন করে না সঠিকভাবে। অনেকে অবাধে নারীপুরুষ মেলামেশা করে। তারপরও তারা ভাবে—আমরা বেশ ভালো আছি। দ্বীনের ওপর আছি। আমাদের ঈমান মজবুত।

আসলে তারা নিজেদের ধোঁকা দিচ্ছে।

এতকিছুর পরও আল্লাহ ﷻ তাঁদের দ্বীনের ওপর থাকার সুযোগ দিয়েছেন। এমন কোনো ফিতনায় ফেলেননি, যা তাদের দ্বীন ইসলাম থেকে বের করে দেবে। তারা এখনো সালাত আদায় করে, সিয়াম পালন করে, ইসলামকে ভালোবাসে। চেষ্টা করে কবীরাহ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার (যদি আমরা ধরে নিই যে ওপরে যে অবহেলাগুলোর কথা বলা হচ্ছে সেগুলোর কারণে এরই মধ্যে তারা কবীরাহ গুনাহতে জড়িয়ে পড়েননি)। এ কারণে, দ্বীনের প্রতি অবহেলা সত্ত্বেও আল্লাহ ﷻ তাদের ইসলামের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করেননি। হিদায়াত বঞ্চিত হবার মতো শাস্তির মুখোমুখি করেননি।

কিন্তু তার মানে এই না যে তারা কিছুই হারায়নি। দ্বীনের প্রতি অবহেলার কারণে তারা হারিয়েছে প্রচণ্ড দামি এক নিয়ামত। যদিও এ নিয়ে তারা বেখবর। তাদের সামনে সুযোগ ছিল ইতিহাসে নিজেদের পদচিহ্ন রেখে যাবার। সুযোগ ছিল আল্লাহর দ্বীনের সমর্থনে এগিয়ে আসার। তারা পারত একটি একটি করে অবহেলিত সুন্নাহকে জীবিত করতে, ফিতনাহর কবর রচনা করতে। তারা পারত সংশয়ের প্রতিরোধ আর বাতিলকে চূর্ণ করতে, ঘুমন্তকে জাগাতে, ইসলামের আলো থেকে দূরে সরে যাওয়া

মানুষগুলোকে আলোর পথ দেখাতে। তারা পারত অজ্ঞতা আর প্রবৃত্তির ফাঁসে নিস্তেজ হয়ে আসা হৃদয়গুলোতে হিদায়াতের প্রাণ ফিরিয়ে আনতে।

তারা ওইসব বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পার, যাদের নাম উচ্চারিত হয় আসমানে। আসমানের অধিবাসীদের সামনে আল্লাহ ﷻ যাদের কথা বলেন। যাদের জন্য ফেরেশতারা দু'আ করেন। তারা হতে পারত অগ্রগামী, সত্যবাদী, শহীদ ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। তারা এমন সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারত যারা কোনো হিসেব এবং শাস্তি ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করবে।

তারা পারত ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিতে। সাহাবায়ে কেরাম ﷺ-এর গৌরবের উত্তরাধিকারী হতে। আল্লাহর ইচ্ছায় দ্বীনের জন্য কুরবানি দিয়ে মানবজাতির জন্য কিয়ামত পর্যন্ত অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে।

তাদের সুযোগ ছিল এ সবকিছু অর্জন করার। কিন্তু অনেক অল্পতে সন্তুষ্ট হয়ে গেল তারা। ভেবেও দেখল না এ মর্যাদা, সম্মান আর মহত্ত্বের কথা । কিংবা ভাবলেও ক্ষণিকের সে ভাবনা দ্রুত মিলিয়ে গেল বিস্মৃতির অতল গহ্বরে। তারপর বছরের পর বছর ফজরের সালাত আদায় করতে তারা হিমশিম খেয়ে গেল। সময় পার হয়ে যেতে থাকল খাওয়া, ঘুম, আলস্য, অফিসের নারী কলিগের ফিতনাহ আর দুনিয়ার খেল-তামাশায় আটকে থেকে।

তাদের জন্য কি আল্লাহর দ্বীনের কাজ থেমে আছে?

না!

আল্লাহ তাঁর দ্বীনের কাজ আর হেফাযতের জন্য বেছে নিয়েছেন অন্য একদল বান্দাকে। তাঁদের সম্মানিত করেছেন। আল্লাহর আনুগত্যের পরীক্ষায় টিকে যাওয়া এই বান্দারা সফল হয়ে গেছেন। তারা তাঁদের জান-মাল দিয়ে কিনে নিয়েছেন জান্নাত। আল্লাহ তাঁদের মর্যাদাকে সুউচ্চ করেছেন। অনন্তকালের জন্য তাঁদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন আরশের অধিপতি। অনিন্দ্য-সুন্দর ফিরদাউসের বাগানে তারা পেয়ে গেছেন সর্বোচ্চ মাকাম।

এই মহাসম্মান, এই মহাসাফল্য হারাবার চেয়ে বড় ক্ষতি আর কী হতে পারে? এরচেয়ে বড় শাস্তি আর কী হতে পারে?

অমূল্য এ সুযোগ হারানো মানুষগুলো শেষমেশ একদিন হয়তো জান্নাতে যাবেন। কিন্তু

সেই দিনের অনুশোচনার তিক্ত স্বাদ নিয়ে যে দিনকে আল্লাহ ﷻ বলেছেন, 'ইয়াউমুত ত্বাগ্বাবুন' (লাভ-লোকসানের দিন)। এটা সেই দিন, যেদিন পাপীরা দুনিয়াতে তাদের পাপের জন্য অনুশোচনা করবে আর সৎকর্মশীলরা আফসোস করবে—কেন দুনিয়াতে তারা আরও সৎকর্ম করল না।

হে আল্লাহ, আপনার রাহমাহর চাদরে আমাদের ভুলগুলো ঢেকে দিন। অনুশোচনার সে দিনের আগে আমাদের শুধরানোর সুযোগ দিন।

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ۖ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۗ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

স্মরণ করো, যখন একত্র করার দিন তিনি তোমাদের একত্র করবেন, সেদিন হবে লাভ-লোকসানের দিন। যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তিনি তার পাপসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে, যার পাদদেশ দিয়ে ঝরনাধারা প্রবাহিত হয়, তথায় তারা স্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য। [তরজমা, সূরা তাগাবুন, ৬৯]।

হাল ছেড়ো না

আজ সারা দুনিয়াজুড়ে মুসলিমরা আক্রান্ত। কোথাও মুসলিমদের ওপর সামরিক আগ্রাসন চালানো হচ্ছে, কোথাও রক্তপিপাসু স্বৈরাচার ব্যারেল বোমা ফেলে নিরীহ শিশুদের হত্যা করছে, কোথাও লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে আটকে রেখে অবর্ণনীয় নির্যাতন করা হচ্ছে কনসেন্ট্রেইশান ক্যাম্পে। বছর বছর লম্বা হচ্ছে আক্রান্ত মুসলিম ভূখণ্ডের তালিকা। এক ভারসাম্যহীন লড়াইয়ের মাঝে আছি আমরা। শিকার হচ্ছি সর্বাত্মক আক্রমণের। আমাদের ওপর শাসক হিসেবে চেপে বসেছে কিছু গাদ্দার। আমাদের মধ্যকার অধিকাংশ মানুষ এখনো চোখ বন্ধ করে আছে, বাস্তবতাকে ভুলে মত্ত হয়ে আছে মিথ্যের মায়াজালে। আর যে অল্প কিছু মানুষ চোখ খুলেছেন তাঁরা মুখোমুখি হচ্ছেন প্রবল প্রতিকূলতার।

এমন পরিস্থিতিতে হতাশ হওয়া, হাল ছেড়ে দেয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু মনে রাখবেন, সবকিছুর চূড়ান্ত ফলাফল আল্লাহ ﷻ-এর সাথেই। এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য।

যখন আমাদের বিরুদ্ধে ওদের নতুন কোনো অপরাধ দেখবেন, মনে রাখবেন, আখিরাতের তুলনায় এ দুনিয়া কিছুই না।

মহান আল্লাহ ﷻ বলেন,

وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

আর আখিরাতে আছে কঠিন আযাব এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবনটা তো ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়। [তরজমা, সূরা আল-হাদীদ, ২০]

মনে রাখবেন, যুলুম ও যালিমের বিরোধিতা বন্ধ করা যাবে না। এ দুনিয়াকে ওদের ইচ্ছেমতো গুনাহের জন্যে ছেড়ে দেয়া যাবে না। দুর্বল হওয়া যাবে না সত্যের সমর্থনে।

পরাজয় মানা যাবে না। আল্লাহর ব্যাপারে সুধারণা রাখতে হবে।

এমন কত মানুষ আছে যাদের গল্প শুরু হয়েছিল অপরাধী ও কাফেরদের হাতে নির্যাতিত হয়ে? কিংবা মযলুমের জন্য দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ে? কিন্তু যালিমের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ হবার বদলে, আল্লাহর ওপর ভরসা করে যালিমের প্রতিরোধের বদলে তারা আল্লাহর ব্যাপারে মন্দ ধারণা করেছিল।

তাই উম্মাহর পুনর্জাগরণের সেনা হবার বদলে তারা উম্মাহর জন্য বোঝায় পরিণত হলো। তলিয়ে গেল পরাজিত মানসিকতা আর সংশয়-সন্দেহের চোরাবালিতে। দুর্বল উম্মাহকে তারা আরও দুর্বল করল। ক্ষতবিচ্ছিন্ন দেহে তৈরি করল নতুন ক্ষত। অপরাধী, যালিমের কবজাকে তারা আরও মজবুত করল।

কিন্তু মনে রাখবেন, গল্পের শেষ এখনো হয়নি। আমরা বীজ বুনে যাই দুনিয়াতে আর ফসল তুলব আখিরাতে।

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর 'অবশ্যই কিয়ামতের দিনে তাদের প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে... [তরজমা, সূরা আলে-ইমরান, ১৮৫]

সব সময় এ আয়াত মনে রাখবেন। এ আয়াত আপনাকে শক্তি জোগাবে নিশ্চয়তার সাথে নিজের জীবনকে এগিয়ে নিতে। এ আয়াত আপনাকে শেখাবে সত্যের কাফেলায় অবিচল থাকতে। যুলুমের কারণে আপনি দুঃখ পাবেন, কষ্ট অনুভব করবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই শোককে শক্তিতে পরিণত করতে হবে, আপনার তীব্র বেদনার অনুভূতিকে পরিণত করতে হবে কাজের চালিকাশক্তিতে। আপনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে পারেন, কিন্তু হতাশ না হয়ে সেই অনুভূতিকে ব্যবহার করুন নিজেকে কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে।

বিশ্বাস করুন, এ যুদ্ধে আমাদের মধ্য থেকে যারা প্রাণ দেবে, ইন শা আল্লাহ তাঁরা হবে আর-রাহমানের বিশেষ অতিথি।

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

জেনে রেখো! আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই আর তারা দুঃখিতও হবে না। [তরজমা : সূরা ইউনুস, ৬২]

আর আমাদের প্রতিপক্ষকেও তাদের পাওনা কড়ায়গন্ডায় পুষিয়ে দেয়া দেয়া হবে।

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ

(সেদিন বলা হবে) 'হে অপরাধীরা, আজ তোমরা আলাদা হয়ে যাও।' [তরজমা, সূরা ইয়া সিন, ৫৯]

মনে রাখবেন, জান্নাতের প্রথম মুহূর্ত দুনিয়ার সব দুঃখকষ্ট ভুলিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। যে ভাইয়ের মৃত্যুতে আজ আপনি কাঁদছেন, যদি রাব্বুল আলামীন তাঁকে শহীদ হিসেবে কবুল করে নেন, তাহলে তাঁকে উদ্দেশ্য করে 'সালাম' বলবেন,

سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ

দয়াময় প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের 'সালাম' বলে সম্ভাষণ করা হবে। [তরজমা, সূরা ইয়া সিন, ৫৮]

আর তারপর শুরু হবে চিরন্তন সুখের নিখুঁত গল্প। যা কখনো ফুরোবে না, কোনো কিছু যে জীবনের সৌন্দর্য ম্লান করতে পারবে না।

আজ যারা আমাদের বিরুদ্ধে অবর্ণনীয় সব অপরাধ করছে, তাদের কী হবে?

জাহান্নামের আগুনের প্রথম স্পর্শ আজকের এই অপরাধীদের ভুলিয়ে দেবে দুনিয়ার সব সুখ-শান্তির স্বাদ। আজকের অহংকারীরা বিচারের দিনে পুনরুত্থিত হবে ছোট ছোট পিঁপড়ার আকারে। জাহান্নামের আগুন তদের ঢেকে রাখবে লাঞ্ছনা ও অপমানে। তারা মরতে চাইবে, শাস্তির শেষ চাইবে, কিন্তু তাদের মৃত্যু দেয়া হবে না।

وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ

তারা চিৎকার করে বলবে, হে 'মালেক (জাহান্নামের দারোয়ান), তোমার রব যেন আমাদের শেষ করে দেন।' সে জবাব দেবে, 'তোমরা (এ অবস্থাতেই পড়ে) থাকবে।' [তরজমা, সূরা আয-যুখরুফ, ৭৭]

দশ, বিশ বছর না, সে আগুনে তারা থাকবে চিরকাল।

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ

নিশ্চয় অপরাধীরা জাহান্নামের আযাবে স্থায়ী হবে...[তরজমা, সূরা আয-যুখরুফ, ৭৪]

আগুনের স্পর্শে নিরন্তর তারা পুড়তে থাকবে। এক অন্তহীন, বিরতিহীন শাস্তি।

وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

আর আখিরাতে আছে কঠিন আযাব এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবনটা তো ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়। [তরজমা, সূরা আল-হাদীদ, ২০]

একদিন আমরা সকলে সমবেত হব বিচারের দিন মালিকের সামনে। আর সেদিন খুব বেশি দূরে নয়।

শরীয়াহ ! কী ভয়ংকর!

শরীয়াহ শব্দটা শুনলেই একশ্রেণির মানুষের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক দেখা দেয়। সুশীল সমাজ, মুক্তমনা, নারীবাদী-শাহবাগী-প্রগতিশীল-সেক্যুলার থেকে শুরু করে মডারেট- মর্ডানিস্ট 'মুসলিম'—শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার কথা বললেই গোল গোল চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকে অনেক মানুষ। কেউ গলার রগ ফুলিয়ে, ঠোঁটের কোনায় থুতু জমিয়ে উত্তেজিতভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে ইসলামী শরীয়াহ কতটা 'বর্বর', 'মধ্যযুগীয়' ও 'অমানবিক'। আবার কেউ-বা ঢোক গেলে সন্তর্পণে।

আরেক দল আমতা আমতা করে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করে। বলে 'আজকের প্রেক্ষাপট ভিন্ন', 'আমাদের নতুন করে চিন্তা করতে হবে', দৃষ্টিভঙ্গি পালটাতে হবে', 'আজকের যুগে ওসব চলবে না'। কেউ-বা আবার বলে, 'শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে কি না তা নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করা হবে না', 'নিজের ঈমান-আমল-আকীদাহ সহিহ আছে তো?', অথবা 'আগে নিজেকে নিয়ে চিন্তা করুন'।

এ ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখার পর, এমন মনে হওয়া অস্বাভাবিক না যে, 'ভয়াবহ' যে দিনে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠিত হবে সেদিন সকালেই হয়তো শহরের কেন্দ্রে সবাইকে জড়ো করা হবে। তারপর উত্তপ্ত লোহার রড দিয়ে তাদের চোখ গেলে দেয়া হবে, ধারালো কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে হাত কাটা হবে, আর সবাইকে দোররা মারা হবে গুনে-গুনে।

যেন কেউ সালাত মিস করলেই টেনেহিঁচড়ে রাস্তায় বের করে আনার জন্য প্রতিটি বাড়ির প্রতিটি জানালায় সেদিন থেকে দাঁড়িয়ে থাকবে অস্ত্রধারী সেনা। যেন শরীয়াহ আর তা কায়েমকারীদের প্রতি কারও বুকের ভেতর কতটুকু ভালোবাসা আর আনুগত্য আছে তার যাররা-যাররা হিসেব নেয়ার জন্য জনসম্মুখে প্রতিটি মানুষের বুক চিরে দেখা হবে। বসা হবে লম্বা হিসেবখাতা নিয়ে!

যেন শরীয়াহ কায়েম করা হচ্ছে শোনামাত্র রাগ-দুঃখ-শোকে লোকেরা লম্বা লাইন দিয়ে ছাদ থেকে একের পর এক লাফিয়ে লাফিয়ে আত্মহত্যা করবে। মহিলারা আতঙ্কে বাচ্চাদের লুকিয়ে রাখবে কিংবা ঝুড়িতে করে নদীতে ভাসিয়ে দেবে! যেন শরীয়াহ নামের এই "বিপর্যয়"-এর কবল থেকে বাঁচতে রাতারাতি ঘরবাড়ি ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে যাবে হাজার-হাজার, না—লাখ-লাখ মানুষ !

এ ধরনের কথাবার্তার কারণে দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞরা, এমনকি আমাদের সাধারণ মুসলিম ভাইবোনদের মধ্যে অনেকে নিজের অজান্তেই ভাবতে শুরু করেন,

কী সর্বনাশ! শরীয়াহ! কী ভয়ংকর!

এ-জাতীয় কষ্টকল্পনাবিলাসী মানুষেরা শরীয়াহ বলতে কোনো শরীয়াহকে বোঝান তা বোঝা আসলেই দুঃসাধ্য। তাদের কল্পনার এ শরীয়াহ কি সে একই শরীয়াহ, যার দিকে আমরা আহ্বান করি? নাকি তারা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর নাযিলকৃত শরীয়াহকে চেঙ্গিস খানের শরীয়াহর সাথে গুলিয়ে ফেলেছে?

যদি তা-ই হয় তবে সবিনয়ে আমরা বলতে চাই,

জনাব, আমরা ওই শরীয়াহর কথা বলছি, যা নাযিল করেছেন আর-রাহমান আর-রাহীম, আল-গাফফার, আল-গাফুর, আল-ওয়াহ্হাব, আল-ওয়াদুদ! যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু। যিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দাতা ও অত্যন্ত স্নেহশীল। যিনি জানেন কিসে মানুষের কল্যাণ আর কোন পথটি দুর্বল মানুষের জন্য সর্বোত্তম।

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না? তিনি সূক্ষ্মজ্ঞানী, সম্যক জ্ঞাত।
[তরজমা, সূরা আল-মুলক, ১৪]

ওই শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা আহ্বান করছি, যা নাযিল করেছেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ ﷻ, যিনি আমাদের আদেশ করেছেন সৎকর্মের এবং অন্যায়ে বাধা দেয়ার। যিনি আদেশ করেছেন আত্মীয়দের অধিকার আদায়ের, যিনি নিষিদ্ধ করেছেন অশ্লীলতা ও পাপাচার।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসংগত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি

তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা স্মরণ রাখো। [তরজমা, সূরা আন-নাহল, ৯০]

আমরা ওই শরীয়াহর কথা আলোচনা করছি, যা আল্লাহ ﷻ নাযিল করেছেন তার দাসদের কষ্ট লাঘবের জন্য। কারণ, তিনি আমাদের দুর্বলতা সম্পর্কে জানেন :

يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا

আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান। মানুষ দুর্বল সৃজিত হয়েছে। [তরজমা, আন-নিসা, ২৮]

আমরা ওই শরীয়াহর কথা বলি, যা একজন পিতাকে নির্দেশ দেয় সন্তানের প্রতি স্নেহশীল হতে। আর সন্তানকে শেখায় পিতামাতার সাথে উত্তম আচরণ করতে, মায়ের পদপ্রান্তে বসে তার সেবা করতে। এটা সেই শরীয়াহ, যা শাসকদের বলে প্রজাদের প্রতি নমনীয় হতে আর অন্যের বিচার করার আগে নিজের বিচার করতে।

আমরা ওই শরীয়াহর কথা বলি, যার দিকে আহ্বান করা, যা হেফাযত করা, যা কায়েম করা প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব। এটি এ উম্মাহর দায়িত্ব এবং আল্লাহ ﷻ-এর নিকটবর্তী হবার জন্য আমাদের জন্য এই পথকেই নির্ধারিত করা হয়েছে। একমাত্র শরীয়াহ কায়েম করার মাধ্যমে সমগ্র উম্মাহ পারে এক অবিচ্ছেদ্য শরীরে পরিণত হবে। একমাত্র শরীয়াহ কায়েম করার মাধ্যমেই উম্মাহ পারে ওই বিশ্বব্যবস্থার দাসত্বের শেকল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে, যা ক্রমাগত উম্মাহর সম্পদ লুট করছে, আর উম্মাহকে অপমানিত, লাঞ্ছিত ও রক্তাক্ত করছে।

এ হলো এমন এক শরীয়াহ, যার অধীনে রাষ্ট্র এমনভাবে ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষিত করে যেভাবে আর কোনো ব্যবস্থা করে না। শুধু একজন মুসলিমের সম্মান, অধিকার, স্বাধীনতা আর রক্ত সংরক্ষণের জন্য, ইসলামী রাষ্ট্র তার সেনাবাহিনী মোতায়েনে বাধ্য। ঠিক যেভাবে আল্লাহর রাসূল ﷺ মু'তাহর যুদ্ধের জন্য সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিলেন, বানু ক্বায়নুকাকে মাদিনা থেকে বহিষ্কার করেছিলেন, সাহাবা ﷛-এর কাছ থেকে আমৃত্যু জিহাদের শপথ নিয়েছিলেন বাইয়াতুর রিদ্বওয়ানের দিনে এবং উসামা ﷛-এর বাহিনীকে প্রেরণ করেছিলেন। প্রতিটি মুসলিম বন্দীকে মুক্ত করা, প্রতিটি মুসলিমের রক্তের প্রতিশোধ নেয়া এই রাষ্ট্রের দায়িত্ব, এই শরীয়াহর দাবি।

আমরা ওই শরীয়াহর কথা বলি, যা মুসলিমদের ধন-সম্পদ লুট করে সুইস ব্যাংকে টাকার পাহাড়, আর মালেয়শিয়ায় সেকেন্ড হোম বানানোয় বাধা দেবে। আমরা ওই শরীয়াহর কথা বলি, যা দেশের জনগণের হাড়ভাঙা খাটুনির মাধ্যমে উপার্জিত, অশ্রু-

রক্ত-ঘামে ভেজা হাজার হাজার কোটি টাকার গায়েব হয়ে যাওয়া ঠেকাবে; অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তি দেবে, সে যে-ই হোক। এ এমন এক শরীয়াহ যা নারীপুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ, সবার জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, নিরাপত্তা, সম্মান এবং শিক্ষা নিশ্চিত করবে। বাস্তবে, শুধু ছাপার অক্ষরে না। আমরা এমন ব্যবস্থার প্রতি আহ্বান করি যে ব্যবস্থায় আলিশান দালানকোঠার সামনেই ডাস্টবিনে কুকুরের পাশে খাবারের খোঁজে ব্যস্ত মানুষ থাকবে না। এ এমন এক ব্যবস্থা, যা নিশ্চিত করবে, জনগণও তা-ই পাবে, যা প্রশাসক পাবে।

এ হলো এমন এক শরীয়াহ, যা অবাধ যৌনতা, লাম্পট্য আর যিনার সবকের বদলে কিশোর-কিশোরীদের শেখাবে সতীত্ব, সম্মান ও দায়িত্ববোধের সঠিক নির্দেশনা। এমন শরীয়াহ, যা পুরুষকে শেখায় দৃষ্টি অবনত রাখতে এবং নারীকে সম্মান করতে। আর নারীকে শেখায় তার সৌন্দর্য ঢেকে রাখার দ্বারা আল্লাহপ্রদত্ত আভিজাত্যপূর্ণ মর্যাদা বজায় রাখতে। এ হলো এমন এক শরীয়াহ, যা সস্তা পণ্যের মতো বিলবোর্ড, ম্যাগাযিন, পর্দায় আর স্টেডিয়ামে নারীদেহের প্রদর্শনকে বাধা দেয়। উচ্ছৃঙ্খল উন্মাদনার বদলে বিশ্বাস, ভ্রাতৃত্ব, আল্লাহভীতি, কল্যাণকামিতা ও পারস্পরিক সম্মানের ভিত্তিতে তৈরি সম্পর্কের মাধ্যমে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে উম্মাহকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রতি আহ্বান করে।

আমরা ওই শরীয়াহর প্রতি আহ্বান জানাই, যা নিশ্চিত করে কোনো খ্যাতিলোভী লেখক নামে কিংবা বেনামে আল্লাহ ﷻ, তাঁর কিতাব, তাঁর দ্বীন ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে অবমাননা করা তো দূরে থাক, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে একটি অক্ষরও লেখার সাহস করবে না।

আমরা ওই শরীয়াহর প্রতি আহ্বান জানাই, যা মাতাল, নেশাখোর, ধর্ষক ও বিকৃতকামীদের অপরাধ, অনাচার ও অজাচার থেকে সমাজকে রক্ষা করে। ওই শরীয়াহ, যা ছাত্রী হোস্টেলের ট্রাঙ্কে বন্দী আর ডাস্টবিনে পলিথিনে প্যাঁচানো পরিত্যক্ত শিশুদের অধিকার রক্ষা করবে।

এমন শরীয়াহ, যা বৃদ্ধাশ্রমে পরিত্যক্ত, বড় থেকে বড় ডিগ্রিধারীদের হতভাগ্য বাবা-মাকে তাদের প্রাপ্য সম্মান দেবে।

শান্তি রক্ষার নামে নারী-শিশুদের শরীর নিয়ে 'শান্তিকামী' যুদ্ধবাজদের নারকীয় অসুস্থতায় মেতে ওঠার লাইসেন্স দেয় না এই শরীয়াহ। একদিকে শান্তি, গণতন্ত্র আর অধিকারের অস্পষ্ট আদর্শিক বুলি শুনিয়ে অন্যদিকে খুঁজে ফেরে না মানুষ মারার নিত্যনতুন উপায়। কাগুজে শান্তির কথা বলে সাম্রাজ্যবাদী লুটপাট চালায় না বিশ্বজুড়ে।

এ এমন কোনো আদর্শ না, যা মানুষকে পশুর কাতারে নামিয়ে এনে আবার সেই পশুর ওপর দেবত্ব আরোপ করে। এ এমন কোনো দর্শন না,যা ভোগ আর শারীরিক সুখের মাপকাঠিতে ভালোমন্দের হিসেব কষে। এ ব্যবস্থা বস্তুর উপাসনা আর সাফল্যকে বাড়ি-গাড়ি-বেতনের পাল্লায় মাপতে শেখায় না। ভোগের মন্ত্র যপে মানুষকে বন্দী করে না উদয়াস্ত ইঁদুর দৌড়ে। উন্নয়ন আর অগ্রগতির ভুল সংজ্ঞায়নে সভ্যতাকে ঠেলে দেয় না ধ্বংসের মুখে।

বরং এ ব্যবস্থা আল্লাহর যমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ওয়াহির আলোকে সত্যিকার অর্থে শান্তি নিশ্চিত করে। এ ব্যবস্থা প্রত্যেককে ওই অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়, যা তার জন্য আল্লাহ ﷻ নির্ধারিত করেছেন। কল্পজগতের কারিকুরি আর কাগুজে তাত্ত্বিকতার বদলে এ শরীয়াহ বাস্তবে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। সমাজকে সঠিক পথ ও পদ্ধতির দিশা দেয়। ভাসা-ভাসা তত্ত্বকথার বদলে বাস্তবসম্মত সমাধান দেয় এ ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা মানুষের দুনিয়াকে জুড়ে দেয় আখিরাতের সাথে।

এই হলো আল্লাহর শরীয়াহ! যা সুস্থ জীবন, বিকাশ ও শিক্ষা নিশ্চিত করে। যা নিরাপত্তা দেয় জান, মাল, সম্মান ও অধিকারের। এই হলো শরীয়াহ, যা বিশুদ্ধ, মর্যাদাপূর্ণ, কল্যাণময়, নমনীয় এবং বরকতপূর্ণ।

আমরা এই শরীয়াহর কথা বলি। মাতাল প্রাচ্যবিদদের নেশাতুর তন্দ্রার দুঃস্বপ্নের কথা বলি না।

সবচেয়ে পরিপূর্ণভাবে যে সমাজ শরীয়াহ কায়েম করেছিল, সেই মদীনাতে যদি, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে দিনরাত পরিকল্পনাকারী মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই বিন সুলুলের জায়গা হয়, শুধু এই কারণে যে সে প্রকাশ্যে ইসলামের বিরোধিতা করেনি—তবে কি এই শরীয়াহ অনুযায়ী শাসিত রাষ্ট্রে আমাদের গুনাহগার মুসলিম ভাইবোনের জায়গা হবে না? যাদের পায়ের ধুলোও আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের চেয়ে উত্তম?

তারপরও যদি এমন কেউ থাকে এ পরিবেশে যার দম বন্ধ হয়ে আসবে, শরীয়াহর আলোতে যে দু-চোখে অন্ধকার দেখবে, লূত আলাইহিস সালামের কওমের মতো যে পবিত্রতা সহ্য করতে পারবে না, যে চার জন সাক্ষীর সামনে ব্যভিচার করা, মদ খেয়ে গন্ধমুখে ঘুরে বেড়ানো আর চুরি না করে থাকতে পারবে না—তবে তার জন্য এই শরীয়াহকে ভয় করাই উচিত। যদি সে এ শরীয়াহ থেকে পালাতে চায়, তবে পালাক। কিন্তু সে তা করুক নীরবে, নিভৃতে। চিৎকার, চেঁচামেচি করে শরীয়াহর ব্যাপারে মানুষকে বিভ্রান্ত করার অধিকার তার নেই। এমন লোক তো গুনাহগার মুসলিমদের

প্রতিনিধিত্বও করে না, কারণ প্রতিটি মুসলিম শরীয়াহকে শুধু ভালোইবাসে না; বরং কায়েম করতেও আগ্রহী, সে নিজে যতই গুনাহ্ করুক না কেন।

শরীয়াহকে অন্তরের অন্তস্তল থেকে কে ঘৃণা করে?

ওই ব্যক্তি, যে নিজের খেয়ালখুশি, কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য, নিজের বিকৃত রুচির লাইসেন্স জোগাড়ের জন্য শরীয়াহকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা চালায়। যে মানুষকে শরীয়াহ থেকে সমাজকে দূরে রাখার জন্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, 'উদারনৈতিকতা', 'স্বাধীনতা', 'মানবাধিকার' আর 'মানবতার' ফাঁপা বুলি আওড়ায়। এমন ব্যবস্থার দিকে আহ্বান করে যেখানে ধনীরা আরও ধনী হয়, গরিব আরও গরিব হয় আর মধ্যবিত্ত চুর হয়ে থাকে ভোগ আর বিনোদনের অতৃপ্ত, অসুস্থ নেশায়। গুম-খুন, সীমাহীন দুর্নীতি, সামাজিক অবক্ষয়, সন্ত্রাস, বেকারত্ব, কৃষকের কষ্ট, সবকিছুর আকাশচুম্বী দাম, শিক্ষাব্যবস্থার ধারাবাহিক অধঃপতন, সীমান্তে হত্যাকাণ্ড, আগ্রাসী প্রতিবেশীর বাড়তে থাকা আগ্রাসন, দেশ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর জমিদারির ভাগবাটোয়ারা, মায়ের হাতে সন্তান খুন, সন্তানের হাতে পিতা-মাতা খুন, বাড়তে থাকা ব্যভিচার, ধর্ষণ, মাদকাসক্তি, উঁচু হতে থাকা অপাপবিদ্ধ সদ্যজাত শিশুদের লাশের পাহাড়—সবকিছুকে সে জিইয়ে রাখতে চায় কেবল নিজের সাময়িক আনন্দের জন্য।

সে এমন স্বাধীনতার কথা বলে, যার অর্থ যুলুম থেকে মুক্তি না; বরং ব্যভিচার, সমকাম, অজাচার, শিশুকাম, পশুকামসহ সব রকমের অবাধ ও বিকৃত যৌনাচারের স্বাধীনতা। নারী অধিকার বলতে সে বোঝায়, নারীকে বিবস্ত্র মাংসপিণ্ডে পরিণত করে সমবায় মালিকানায় বাজারের 'মাল' বানানোর অধিকারকে। তার কাছে মানবাধিকারের অর্থ হলো পশ্চিমা সাদা মানুষের নির্বিঘ্নে মুসলিম হত্যা, মুসলিমদের সম্পদ লুট, আর তারপর মুসলিমদেরই দোষারোপ করার অধিকার। যখন সে শান্তির কথা বলে তখন বোঝায় পশ্চিমা প্রভুদের জমিদারি রক্ষার জন্য নির্বিচারে গণহত্যার বৈধতা দেয়াকে। কবরস্থানের শান্তিকে। হিরোশিমা-নাগাসাকির শান্তিকে। আবু গুরাইব আর গুয়ানতানামোর শান্তিকে। কনসেনট্রেইশান ক্যাম্পের শান্তিকে।

নৈতিকতা তার কাছে খেয়ালখুশির অনুসরণ, তার প্রভু হলো তার কামনা-বাসনা, আর তার পশ্চিমা মালিকরা।

আর হ্যাঁ, এমন লোকগুলোর জন্য শরীয়াহ আসলেই ভয়ংকর।

কিন্তু বাকি সবার জন্য শরীয়াহ হলো সমগ্র সৃষ্টি জগতের একমাত্র মালিক, আসমান ও যমীনের একচ্ছত্র অধিপতি, মহান স্রষ্টা আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে রাহমাহ ও

নিয়ামত। একমাত্র এই শরীয়াহর ছায়াতলেই সম্ভব তাওহীদ, ইনসাফ, দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও মুক্তির প্রতিষ্ঠা।

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। [তরজমা, সূরা আল-মা'ইদা, ৩]

ড. ইয়াদ আল-কুনাইবী।

জন্ম: শাওয়াল, ১৩৯৫ হিজরি (অক্টোবর, ১৯৭৫)। আদি নিবাস ফিলিস্তিনের হেবরনে। এখন স্থায়ীভাবে আছেন আম্মানে। ড. ইয়াদ আল-কুনাইবী একজন দা'ঈ এবং অ্যাকটিভিস্ট। মানুষকে ইসলাম নিয়ে সচেতন করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন প্রায় দুই যুগ ধরে।

গ্র্যাজুয়েশন এবং ডক্টরেট করেছেন ফার্মাকোলজির ওপর। পাশাপাশি কুরআন তিলাওয়াতের ওপর তিনি ইজাযাহ অর্জন করেছেন শাইখ আব্দুর রহমান বিন আলী আল মাহমুদের কাছ থেকে হাফস বিন আসিম ﷺ এর সনদে। এ ছাড়া আলিমগণের তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন করেছেন এবং ইজাযাহ অর্জন করেছেন ফিকহ, সীরাহ এবং তাফসীরশাস্ত্রে।

লেখালেখি, বয়ান এবং মসজিদকেন্দ্রিক কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছেন ছাত্রজীবন থেকেই। নিজ সামাজিক বলয়ের পাশাপাশি অনলাইন এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তিনি সমান সক্রিয়। ড.ইয়াদ কুনাইবীর লেখনী ও বক্তব্যের আলোচনার বিষয়বস্তু বিস্তৃত। ধর্মীয়, সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিভিন্ন বিষয়ে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর অনেকগুলো প্রবন্ধ ও লেকচার। ব্যক্তি-জীবন, পরিবার, সমাজ রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষা বাস্তবায়ন নিয়ে সমান গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেন তিনি।

ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট: www.al-furqan.com

আয়না!

হয়তো আমরা খেয়াল করি অথবা করি না, কিন্তু আমাদের জীবনের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার সাথে জড়িয়ে থাকে আয়না। জীবনপথে ক্লান্ত হয়ে আয়নায় আশ্রয় খুঁজি আমরা।

জান্নাত বা জাহান্নাম পর্যন্ত বিস্তৃত এই পথে চলতে গিয়ে ধুলো জমে আমাদের হৃদয়েও। চিরচেনা আয়নায় বিকৃত হতে থাকে প্রতিবিম্ব। পরতের পর পরত জমে ময়লা। একের পর এক হাতে তুলে নিই নানা মতবাদ, নানা 'তন্ত্রমন্ত্রের' আয়না। ধরা পড়েনা অসুখ। ক্রমাগত আয়না বদলাই। ভুল প্রতিবিম্ব আর ভুল চিকিৎসায় আরও বাড়ে যন্ত্রণা। পুরু হতে থাকে ময়লার পরত...

কিন্তু জানেন, রূপকথার স্নো-হোয়াইটের সেই জাদুর আয়নার চাইতেও শতগুণ বেশি নির্ভুল আয়না ছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে? সেই আয়না দেখে পরিপাটি করে তাঁরা সাজিয়েছিলেন নিজেদের। সাজিয়েছিলেন এই পৃথিবীকে। সেজেছিল মেঘ; রোদ, জোছনা; সেজেছিল মরু, নদী, সাগর। তাঁরা মানুষকে ডেকেছিলেন সৃষ্টির দাসত্ব থেকে স্রষ্টার দাসত্বের দিকে; এ দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে দুনিয়া ও আখিরাতের প্রশস্ততার দিকে। লিখেছিলেন মাটির পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে মহাকাব্যিক অধ্যায়টি...।

ধুলো পড়া সময়ে হারিয়ে যাওয়া সেই আয়নার কথা মনে করিয়ে দিতেই আমাদের এই আয়োজন...

আয়নাঘর।